সামাজিক বিজ্ঞান

ভাগ -২

ভূগোল

সপ্তম শ্রেণী

শিক্ষক শিক্ষা নির্দেশালয় এবং
রাজ্যশিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ,
ওড়িশা, ভুবনেশ্বর।

ওড়িশা বিদ্যালয় শিক্ষা
কার্য্যক্রম প্রাধিকরণ
ওড়িশা, ভুবনেশ্বর

ভূগোল

সপ্তম শ্রেণী

সম্পাদক মণ্ডলী:

প্রফেসার সচ্চিদানন্দ ত্রিপাঠী

ড. সর্বেশ্বর সামল

ড. নিরঞ্জন দাশ

শ্রীমতী পূর্ণমাসী মহাপাত্র

শ্রী অন্তর্যামী প্রধান

শ্রী গৌরীশঙ্কর মিশ্র

সমীক্ষক মণ্ডলী:

শ্রী প্রভাকর প্রধান

ড. দেবরাজ সাহু

শ্রী রঞ্জন কুমার সাহু

সংযোজনা:

ডঃ প্রীতিলতা জেনা

ডঃ তিলোত্তমা সেনাপতি

ডঃ সবিতা সাহু

অনুবাদক মণ্ডলী:

প্রফেসার দিপাস্য কুণ্ডু (অনুবাদক)

শ্রীমতী সুচিত্রা দাস

শ্রীমতী মধুমিতা ব্যানার্জ্জী (সমীক্ষক)

সংযোজনা:

ডঃ সবিতা সাহু

প্রকাশক: বিদ্যালয় ও গণশিক্ষা বিভাগ, ওড়িশা

মুদ্রণ বছর: ২০২৩

মুদ্রণ: পাঠ্যপুস্তক উৎপাদন ও বিক্রয়, ওড়িশা, ভুবনেশ্বর

প্রস্তুতি: শিক্ষক শিক্ষা নির্দেশালয় এবং রাজ্য শিক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, ওড়িশা, ভুবনেশ্বর

ও

ওড়িশা রাজ্য পাঠ্যপুস্তক প্রনয়ন ও প্রকাশন সংস্থা, ওড়িশা, ভুবনেশ্বর

সূচীপত্র

অধ্যায়	প্রসঙ্গ	পৃষ্ঠা
প্রথম	প্রথম পাঠ: আমাদের পরিবেশ	01-06
	দ্বিতীয় পাঠ: শিলা ও খনিজ	07-11
	তৃতীয় পাঠ: ভূমিরূপ	12-26
দ্বিতীয়	বায়ুমণ্ডল	27-42
তৃতীয়	বারিমণ্ডল	43-56
চতুর্থ	জৈবমণ্ডল	57-74
পঞ্চম	ব্যাবহারিক ভূগোল	75-82
ষষ্ঠ	মানবীয় পরিবেশ—জনবসতি	83-100
	পরিবহন ও যোগাযোগ	
সপ্তম	পারিবেশিক প্রভাব ও	101-115
	অধিবাসীদের জীবন জীবিকা	

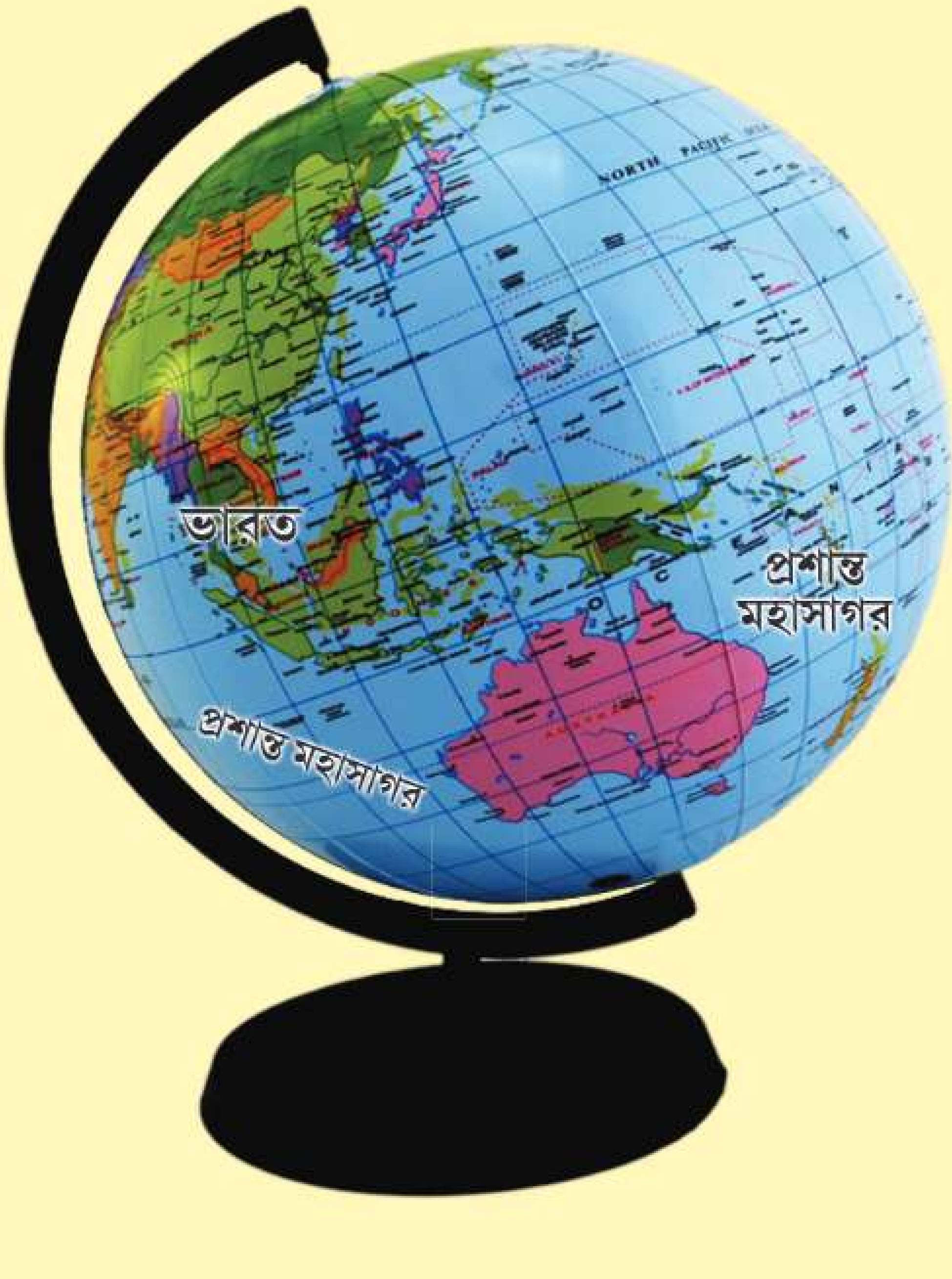

ভারত
প্রশান্ত মহাসাগর
প্রশান্ত মহাসাগর

আমাদের পরিবেশ

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পাঠ

রজত ভুবনেশ্বরে ওর মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে। গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হল। বন্ধুদের সঙ্গে রজত স্কুলে পৌঁছল। কারণ তারা কিছুক্ষণ পেছন দিকের খেলার মাঠে খেলবে। কিন্তু তাদের প্রিয় খেলার মাঠটা আগের মতো আর নেই। ওখানে খোঁড়াখুঁড়ি করে কিছু নির্মাণকার্য চলছে। লোকেদের জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে ওখানে একটা বহুতল বাড়ি তৈরি হবে। তাতে অনেক পরিবার বাস করবে। রজতের মনে খুব কষ্ট হল। খেলার মাঠের সুন্দর সবুজ কোমল ঘাস, পাশে ছোট ছোট ফুলের কেয়ারি, রংবেরঙের প্রজাপতির দল চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। রজত তার বন্ধুদের সঙ্গে এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করল। সেদিন শ্রেণীগৃহেও শিক্ষক মশাই বললেন, 'দেখ আমাদের পরিবেশ কিভাবে বদলাচ্ছে।'

'স্যার পরিবেশ কি?' রজত জিজ্ঞাসা করল। শিক্ষক বললেন, 'তোমার চারপাশে যা রয়েছে সেটাই পরিবেশ।' রজত বলল—তাহলে আমাদের বিদ্যালয়, শ্রেণীতে থাকা টেবিল-চেয়ার, খোলা মাঠ, রাস্তা, আবর্জনা, শ্রেণীতে আমার বন্ধুরা, এরা সবাই আমাদের পরিবেশের অঙ্গ?

শিক্ষক বললেন, হ্যাঁ। তবে দেখ এর মধ্যে কিছু প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন—পাহাড়, ঝর্ণা, গাছপালা, জীবজন্তু ইত্যাদি। আবার অন্য সব মানুষ তৈরি করেছে। যেমন—রাস্তাঘাট, গাড়ি, পোশাক ইত্যাদি।

তোমরা এখন বসে বসে মোটামুটি কোন্‌গুলো প্রকৃতি সৃষ্টি করেছে আর কোন্‌গুলো মানুষ তৈরি করেছে তার একটা তালিকা করো।

পরমজিৎ জিজ্ঞাসা করল, 'স্যার আমাদের পরিবেশ কেন বদলাচ্ছে?'

শিক্ষক বললেন, 'এটা কেবল আমাদের আবশ্যকতা পূরণের জন্য হচ্ছে। আমাদের আবশ্যকতা দিন-কে-দিন বেড়ে চলেছে।'

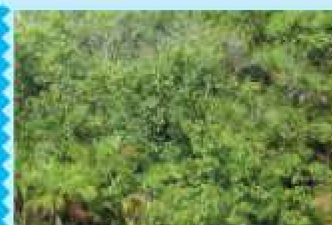

পরিবেশই জীবনধারণের জন্য মৌলিক আধার জুগিয়ে থাকে। আমাদের নিঃশ্বাসের জন্য হাওয়া, পান করার জল, খাওয়ার জন্য খাদ্য এবং ঘরের জন্য ভূমি পরিবেশ জুগিয়ে থাকে।

মানুষ পরিবেশে পরিবর্তন আনে কীভাবে? মোটরগাড়ির নির্গত ধোঁয়া বায়ুকে দূষিত করে। কলসিতে জল সংগ্রহ করা হয়, পাত্রে খাদ্য পরিবেশন করা হয় এবং কলকারখানা বসানোর জন্য ভূমির দরকার হয়।

মানুষ গাড়ি তৈরি করে, বড় বড় কলকারখানা দ্বারা আবশ্যকীয় জিনিস তৈরি করে, জিনিসকে ধরে রাখতে বিভিন্ন পাত্রও প্রস্তুত করে। এইভাবে মানুষ পরিবেশে পরিবর্তন এনে থাকে।

চিত্র ১.১ পরিবেশের উপাদান

ভৌতিক পরিবেশ

পৃথিবীর জল, স্থল, বায়ুকে নিয়ে ভৌতিক পরিবেশ গঠিত। তোমরা পূর্ব শ্রেণীতে অশ্মমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল ও জৈবমণ্ডলের সম্বন্ধে পড়েছ। এসো এদের সম্বন্ধে অধিক জানব।

পৃথিবীর কঠিন ভূত্বক বা শক্ত উপরিভাগকে অশ্মমণ্ডল বলা হয়। এটা বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য ও শিলায় গঠিত। এর উপরিভাগে মৃত্তিকার একটি পাতলা আবরণ আছে। পৃথিবীর উপরিভাগ অসমান। পর্বত, মালভূমি, সমতলভূমি, উপত্যকা ইত্যাদি ভূমিরূপের জন্য ভূপৃষ্ঠ অসমান হয়ে থাকে। এই ভূমিরূপ স্থলভাগ ও সমুদ্রশয্যা উভয় স্থানেই রয়েছে।

চিত্র ১.২ পরিবেশের পরিসর

অশ্মমণ্ডল পরিসর থেকে আমরা অত্যাবশক জঙ্গল দ্রব্য, চারণভূমি থেকে ঘাস, কৃষির জন্য ভূমি ও জনবসতির জন্য জায়গা পেয়ে থাকি। এর থেকে খনিজ সম্পদও পাওয়া যায়।

পৃথিবীর সমস্ত জলরাশিকে বারিমণ্ডল বলা হয়। এটা জলের বিভিন্ন উৎস ও বিভিন্ন প্রকার জলরাশি যথা—নদী, হ্রদ, সমুদ্র, মহাসাগর ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য এটা এক অত্যাবশ্যক উপাদান।

পৃথিবীকে চতুর্দিকে ঘিরে থাকা পাতলা গ্যাসীয় আবরণকে বায়ুমণ্ডল বলা হয়। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য বায়ু পৃথিবীতে লেগে রয়েছে। এটা সূর্য থেকে আসা ক্ষতিকারক রশ্মি তথা অত্যধিক উত্তাপ থেকে আমাদের রক্ষা করে। বিভিন্ন গ্যাস, ধূলিকণা ও জলীয় বাষ্প নিয়ে বায়ুমণ্ডল গঠিত। বায়ুমণ্ডলে পরিবর্তনের জন্য আবহাওয়া ও জলবায়ুতে পরিবর্তন ঘটে।

উভয় প্রাণী ও উদ্ভিদ নিয়ে জৈবমণ্ডল গঠিত। ইহা অশ্মমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল ও বারিমণ্ডল-এর অন্তর্গত পারস্পরিক সম্বন্ধ থাকা তথা জীবন ধারণের জন্য আবশ্যক উপাদান থাকা পাতলা স্তরকে বোঝায়।

তোমার জন্য কাজ

তোমার চারপাশ নিরীক্ষণ করো। ভূমিকে কী কী কার্যে বিনিয়োগ করা হয়েছে তার এক তালিকা প্রস্তুত করো।

তোমার জন্য কাজ

তুমি বাড়িতে বা স্কুলে ব্যবহার করা জল কোথা থেকে আসছে? দৈনন্দিন জীবনে জলের বিভিন্ন ব্যবহার সম্বন্ধে তালিকা প্রস্তুত করো। কেউ জল অপচয় করা দেখেছ কি? এটা কীভাবে হচ্ছে?

তোমার জন্য কাজ

প্রতিদিন স্কুলে আসার সময় আকাশটাকে লক্ষ করো। দিনটা মেঘলা, না বৃষ্টি হচ্ছে, না কটকটে রোদ হচ্ছে বা কুয়াশাঘন হয়ে আছে কিনা লিখে রাখো।

পরিসংস্থা কী ?

তুমি জানো কি ?

পরিসংস্থা:

কোনো পরিবেশে থাকা সমস্ত জীবের মধ্যে নির্ভরশীলতা তথা তাদের পরিবেশের অন্তর্গত ভৌতিক ও রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে অন্তঃসম্বন্ধ থেকে পরিসংস্থা গড়ে ওঠে। এ সবই শক্তি ও দ্রব্যের আদানপ্রদান সম্পর্কিত।

একবার রজতের স্কুলে জাতীয় সমর শিক্ষার্থী শিবির আয়োজিত হল। তাতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ছেলেরা তাদের অঞ্চলের বিষয়ে বলছিল। জেসি কেরলের মেয়ে। সে তাদের রাজ্যে প্রবল বর্ষা হওয়ার ব্যাপারে বলল। সেখানকার চিরসবুজ ভূমি ও বিস্তীর্ণ নারিকেল বাগানে বেড়াতে সবাইকে নিমন্ত্রণ করল।

রাজস্থানের জয়সলমির থেকে আসা হিরা বলল, 'আমরা বর্ষা প্রায় পাই না। আমাদের ওখানে বেশিরভাগ চারিদিকে বালি আর ছোট ছোট কাঁটাঝোপ। তোমার যতদূর চোখ যাবে খালি এইসব দেখতে পাবে।' মাঝখান থেকে রজত বলে ফেলল 'তোমাদের ওখানে উট দেখতে পাওয়া যায়।' হিরা বলল, 'খালি উট নয়, মরুভূমিতে সাপ, বিভিন্ন সরীসৃপ ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়।'

তোমার জন্য

এনসিসি-র ছেলেদের মতো তোমার স্কুলের কিংবা তোমার থাকার স্থানের একটি রেখাচিত্র প্রস্তুত করো।

চিত্র ১.৩ পরিসংস্থা

তুমি জানো কি ?

প্রত্যেক বছর জুন মাসের ৫ তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়।

রজত আশ্চর্য হয়ে ভাবল, অঞ্চল থেকে অঞ্চলে বৃক্ষলতা, প্রাণী ও লোকেদের চালচলনে পার্থক্য রয়েছে কেন ? এসব কি পরস্পর সম্বন্ধিত ?

রজত শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করাতে শিক্ষক বললেন, 'হ্যাঁ, আঞ্চলিক পরিবেশের সঙ্গে বৃক্ষলতা, প্রাণী ও লোকেদের চালচলনের যথেষ্ট সম্পর্ক আছে। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বৃক্ষলতা, প্রাণী ও মানুষ বাঁচার জন্যে পরিবেশের উপরে নির্ভর করে।

অনেক সময় এরা পরস্পরের উপরেও নির্ভর করে থাকে। প্রাণী, উদ্ভিদ ও মানুষের পরস্পরের সঙ্গে তাদের পরিবেশের সঙ্গে গড়ে ওঠা নিবিড় সম্পর্ক তথা নির্ভরশীলতা থেকে পরিসংস্থার সৃষ্টি হয়। সুতরাং এক বিস্তৃত চিরহরিৎ অরণ্য, চারণভূমি, মরুভূমি, পর্বত, হ্রদ, নদী, মহাসাগর এমনকি একটি ছোট পুষ্করিণীর মধ্যেও পরিসংস্থা গড়ে ওঠে।'

তোমার বাড়ির কাছের খেলার মাঠ বা পার্কে এমন একটি পরিসংস্থা গড়ে উঠেছে কি?

মানবীয় পরিবেশ

মানুষ তার আবশ্যকতা মেটাবার জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে থাকে। যার ফলে পরিবেশে পরিবর্তন হয়। আদিম মানুষের আবশ্যকতা খুব কম ছিল এবং তারা প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলত। তারা আবশ্যক পদার্থটি সিধে তার চারপাশ থেকে সংগ্রহ করত। সময়ানুক্রমে মানুষের আবশ্যকতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। সে পরিবেশকে ব্যবহার উপযোগী তথা পরিবর্তিত করার নতুন উপায় সব বের করল। সে কৃষি করা জানল, বিভিন্ন পশুকে ঘরে পালন করল এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগল। ক্রমে গাড়ির চাকা উদ্ভাবন হল, খাদ্য উৎপাদন বাড়ল, দ্রব্য বিনিময় আরম্ভ হল এবং বাণিজ্য কারবার বৃদ্ধি পেল। শিল্প বিপ্লবের ফলে বিভিন্ন রকমের দ্রব্য বহুল পরিমাণে উৎপাদিত হল। পরিবহণ দ্রুততর হল। সূচনা বিপ্লবের ফলে সমগ্র পৃথিবীতে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ ও সরল হল।

মানুষের জীবনধারা পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। গরমকালে তোমার তরমুজ আর শীতকালে গরম গরম মুড়ি-বাদাম কেন ভালো লাগে তুমি কখনও চিন্তা করেছ কি? প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক ও মানবীয় পরিবেশের মধ্যে এক সুষম ভারসাম্যের আবশ্যকতা আছে। সুতরাং পরিবেশে বাঁচা এবং একে ব্যবহার করার সময় মানুষকে যথেষ্ট যত্নশীল হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

তুমি জানো কি?

দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থা

টাকার বিনিময় ছাড়া হওয়া ব্যাপারকে দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থা বলা হয়।

তোমার জন্য কাজ

তোমার আশপাশে থাকা বয়স্ক লোকদের সঙ্গে কথা বলে নিম্নোক্ত কিছু তথ্য সংগ্রহ করো।

- তাঁরা তোমার বয়সে থাকার সময়ে চারপাশে দেখা বৃক্ষলতা।
- তাঁরা ঘরে বসে খেলতে থাকা খেলা।
- তোমার বয়সে তাঁদের প্রিয় ফল।
- গরম ও শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ওঁরা কী করতেন?

তোমার পাওয়া উত্তর একটা বড় কাগজে লিখে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখো বা বুলেটিনের আকারে প্রকাশ করো।

প্রশ্নাবলী

১. **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।**

(ক) পরিসংস্থা কী?

(খ) প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে কী বোঝায়?

(গ) পরিবেশের মুখ্য অংশগুলি কী?

(ঘ) অশ্মমণ্ডল কী?

(ঙ) জৈবিক পরিবেশের দুটি মুখ্য অংশ কী?

(চ) জৈবমণ্ডল কাকে বলে?

২. **ঠিক উত্তরটি বেছে লেখো।**

(i) কোন্‌টা একটি প্রাকৃতিক পরিসংস্থা নয়?

(ক) মরুভূমি (খ) অ্যাকোয়ারিয়াম (গ) জঙ্গল

(ii) কোন্‌টা মানবীয় পরিবেশের অঙ্গ নয়?

(ক) ভূমি (খ) ধর্ম (গ) সম্প্রদায়

(iii) কোন্‌টা এক মানবকৃত পরিবেশ?

(ক) পর্বত (খ) সমুদ্র (গ) রাস্তা

(iv) কোন্‌টা পরিবেশের পক্ষে বিপজ্জনক?

(ক) বাড়তে থাকা উদ্ভিদ (খ) বাড়তে থাকা জনসংখ্যা (গ) বাড়তে থাকা শস্য

৩. **স্তম্ভ দুটির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে লেখো।**

	ক স্তম্ভ		খ স্তম্ভ
(I)	জৈবমণ্ডল	(ক)	পৃথিবীকে ঘিরে থাকা গ্যাসীয় স্তর
(ii)	বায়ুমণ্ডল	(খ)	জলরাশি
(iii)	বারিমণ্ডল	(গ)	আমাদের পরিবেষ্টনী
(iv)	পরিবেশ	(ঘ)	জল, স্থল, বায়ুর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা পাতলা স্তর

৪. **কারণ দেখাও**

(ক) মানুষ পরিবেশে পরিবর্তন এনে থাকে।

(খ) প্রাণী ও উদ্ভিদ পরস্পর নির্ভরশীল।

(গ) মানুষ প্রকৃতির বিনা সহায়তায় চলতে পারে না।

তোমার জন্য কাজ :

তুমি বসবাস করতে চাওয়া এক আদর্শ পরিবেশের সম্বন্ধে চিন্তা করো। সেই পরিবেশের একটি চিত্র অঙ্কন করো।

পৃথিবীর অভ্যন্তর

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় পাঠ — শিলা ও খনিজ

পৃথিবী আমাদের বাসস্থান। এটি একটি চলনশীল গ্রহ। এর উপরে এবং ভেতর অংশে সর্বদা পরিবর্তন লেগে রয়েছে। পৃথিবীর ভেতরে কী আছে ও পৃথিবী কীসে গড়া? তোমার মনে এ প্রশ্ন উঠেছে কি? এসো এ বিষয়ে আলোচনা করব।

পৃথিবীর অভ্যন্তর কয়েকটি স্তর নিয়ে গঠিত। এই স্তরগুলি পিঁয়াজের খোসার মতো একটার পর একটা রয়েছে। পৃথিবী বর্তুলাকার হওয়ায় এই স্তরগুলিও বর্তুলাকার।

চিত্র ১.৪: ভূঅভ্যন্তর

সবার উপরে থাকা স্তরকে ভূত্বক (ত্বক অর্থ চর্ম) বলা হয়। শরীরকে চর্ম ঢেকে রাখার মতো ভূত্বক পৃথিবীকে ঢেকে রয়েছে। এই কঠিন স্তরটি সবচেয়ে পাতলা। মহাদেশের তলায় থাকা ভূত্বক প্রায় ৫০ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে মহাসাগরের তলায় এটার মোটা মাত্র ৫ কিলোমিটার।

তুমি জানো কি?

- পৃথিবীর গভীরতম খনি দক্ষিণ আফ্রিকাতে আছে। এর গভীরতা প্রায় ৪ কিলোমিটার। তেল অনুসন্ধানের জন্য ইঞ্জিনিয়াররা প্রায় ৬ কিলোমিটার গভীর গর্ত খুঁড়ছেন।
- পৃথিবীর কেন্দ্রে (যা সম্ভব নয়) পৌঁছনোর জন্য আমাদের সমুদ্রতল থেকে প্রায় ৬৪০০ কিলোমিটার গভীর গর্ত খুঁড়তে হবে।
- পৃথিবীর মোট ঘনফলের ০.৫ ভাগ ভূত্বক, ১৬.৫ ম্যান্টাল ও ৮৩ ভাগ কোর আছে।
- পৃথিবীর মোটামুটি ব্যাসার্ধ ৬৩৭১ কিলোমিটার।

ভূত্বকের মহাদেশীয় অংশ মুখ্যত সিলিকা ও অ্যালুমিনারে গঠিত। সেইজন্য একে সিআল (সিলিকাঅ্যালুমিনা) স্তর বলা হয়। মহাসাগরীয় ভূত্বক মুখ্যত সিলিকা ও ম্যাগনেসিয়াম দ্বারা গঠিত। সংক্ষেপে একে সিমা (সিলিকাম্যাগনেসিয়াম) স্তর বলে বলা হয়।

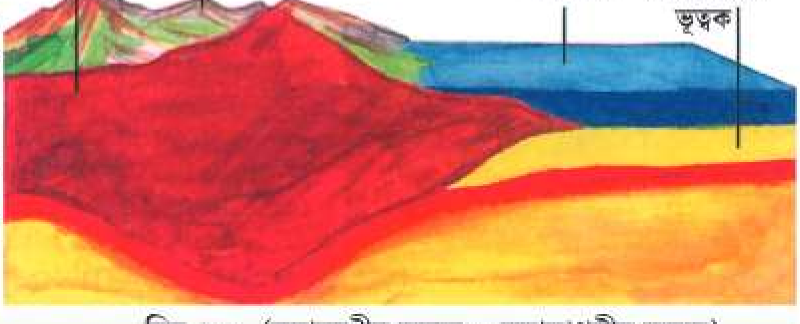

চিত্র ১.৫. (মহাদেশীয় ভূত্বক ও মহাসাগরীয় ভূত্বক)

ভূত্বকের তলায় থাকা স্তরকে ম্যান্টাল বা মধ্যমণ্ডল বলে। এটা প্রায় ২৯০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরে সিলিকা, ম্যাগনেসিয়াম সহ বিভিন্ন ধাতব পদার্থ থাকার কথা জানা যায়।

সবথেকে ভেতরে থাকা স্তরকে কোর বা কেন্দ্রমণ্ডল বলা হয়। এই স্তরের ব্যাসার্ধ প্রায় ৩৫০০ কিলোমিটার। এটা মুখ্যত লোহা, নিকেলের মতো ভারী ধাতুতে গঠিত। তাই এই স্তরকে 'নিফে' (নিকেল্‌ফেরাস) (লোহার রাসায়নিক নাম ফেরাস) স্তর বলা হয়। এখানে অত্যধিক চাপ ও তাপমাত্রা থাকার কথা জানা যায়।

শিলা ও খনিজ পদার্থ

ভূত্বক শিলায় গঠিত। খনিজ পদার্থের মিশ্রণে শিলা সৃষ্টি হয়। শিলাদের রং, আকার ও গঠন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। ভূত্বক শিলাকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা—আগ্নেয় শিলা, স্তরীভূত শিলা ও রূপান্তরিত শিলা।

আগ্নেয় শিলা :

ভূত্বকের নীচে শিলা তরল বা অর্ধতরল অবস্থায় থাকে। একে ম্যাগনা বলা হয়। মাঝে মাঝে ম্যাগনা ভূপৃষ্ঠের দিকে প্রবাহিত হয়। ভূপৃষ্ঠে ম্যাগনাকে লাভা বলা হয়। লাভা ক্রমে শীতল ও কঠিন হয়ে আগ্নেয় শিলায় পরিণত হয়। প্রথমে সৃষ্টি হওয়ায় আগ্নেয় শিলাকে প্রাথমিক শিলা বলা হয়। আগ্নেয় শিলা দু' প্রকার। যথা—**নিঃস্রবজ ও অন্তর্ভেদী আগ্নেয় শিলা।**

তুমি জানো কি?

শিলাস্তরের মধ্যে থাকা প্রাণী ও উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশকে জীবাশ্ম বলা হয়।

কিছু আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে অতি উত্তপ্ত তথা তরল ম্যাগনা লাভারূপে ভূপৃষ্ঠে জমা হয়। এটা শীঘ্র শীতল ও কঠিন হয়ে যায়। ভূপৃষ্ঠে সৃষ্টি এই শিলাকে **নিঃস্রবজ** শিলা বলা হয়। এগুলো অতি ছোট ছোট রেণু দ্বারা গঠিত। ব্যাসাল্ট-এর এক উদাহরণ। মাঝে মাঝে লাভা ওপরে উঠতে না পেরে ভূত্বক শিলার মধ্যে ধীরে ধীরে শীতল ও কঠিন হয়ে শিলায় পরিণত হয়। একে **অন্তর্ভেদী** আগ্নেয় শিলা বলা হয়। এ ধরনের শিলায় বড় বড় স্ফটিক বা দানা থাকে। গ্রানাইট এর উদাহরণ।

বড় বড় শিলাগুলি ক্রমে ফেটে গিয়ে ছোট হয়ে যায়। এছাড়া উঁচু স্থান থেকে গড়িয়ে পড়ার দরুন পরস্পর সংঘর্ষ হওয়ায় শিলা ছোট ছোট পাথর, কাঁকর, বালি ও ধুলোতে পরিণত হয়। এদেরকে জলস্রোত ও পবন বয়ে নিয়ে স্তরকে স্তর নিম্নভূমিতে জমা করে। কালক্রমে এগুলো কঠিন হয়ে শিলায় পরিণত হয়।

এই প্রকার সৃষ্ট শিলাকে **অবক্ষিপ্ত শিলা বা স্তরীভূত শিলা** বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, বালুকারাশি কঠিন হয়ে বেলে পাথরে পরিণত হয়। এই ধরনের শিলায় বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহের অবশিষ্টাংশ বা জীবাশ্ম সঞ্চিত হয়ে থাকে।

ভূত্বকের অভ্যন্তরে অত্যধিক তাপ ও চাপের প্রভাবে কিছু আগ্নেয় ও স্তরীভূত শিলার রূপগুণে পরিবর্তন হয়। ফলে এগুলো নতুন শিলায় পরিণত হয়। এদেরকে রূপান্তরিত শিলা বলা হয়। যেমন—কদম শিলা রূপান্তরিত হয়ে স্লেটে ও চুনাপাথর মার্বেলে পরিণত হয়।

তোমার জন্য কাজ

তোমার অঞ্চলে পাওয়া বিভিন্ন প্রকার শিলা সংগ্রহ করো। সেগুলো কী প্রকার শিলা জানতে চেষ্টা করো।

শিলা আমাদের অতি দরকারি পদার্থ। কঠিন শিলাগুলোকে রাস্তা, ঘরবাড়ি তথা অন্যান্য নির্মাণকার্য ব্যবহার করা হয়। পাথর এবং নুড়ি ব্যবহার করে বাচ্চারা খেলাধূলাও করে।

নিম্নে তোমার জন্য দুটি ফটোচিত্র সংগ্রহ করে দেওয়া হয়েছে। কোন্‌টা কী প্রকার শিলায় তৈরি হয়েছে?

চিত্র ১.৬ কোনার্ক

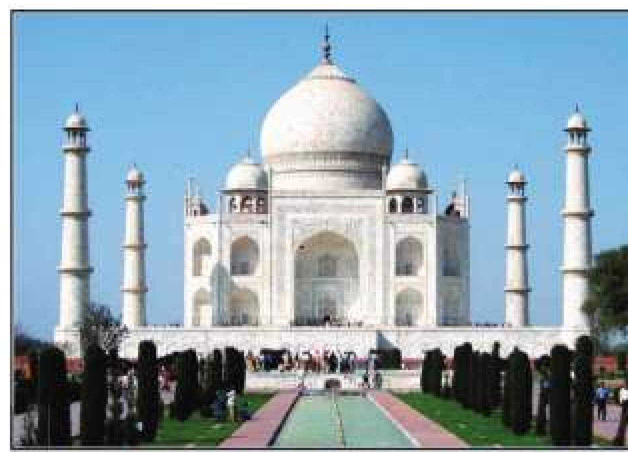

চিত্র ১.৭ তাজমহল

তুমি জেনে আশ্চর্য হয়ে যাবে যে প্রত্যেক শিলা অনুকূল পরিস্থিতিতে অন্য এক শিলায় পরিণত হয়ে যায়। এই পরিবর্তন এক নিয়মিত ধারায় হয়ে থাকে। একে শিলাচক্র বলা হয়। আমরা জানি যে আগ্নেয়শিলা ছোট ছোট টুকরো হয়ে নিম্ন ভূমিতে জমা হয়। ক্রমে এটা অবক্ষিপ্ত শিলায় পরিণত হয়। উভয় আগ্নেয় ও অবক্ষিপ্ত শিলা অত্যধিক তাপ ও চাপের প্রভাবে রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হয়। রূপান্তরিত শিলা অত্যধিক তাপের প্রভাবে এলে অর্ধ তরল ম্যাগ্মায় পরিণত হয়। এই ম্যাগ্মা আবার শীতল ও কঠিন হয়ে আগ্নেয় শিলায় পরিণত হয়ে থাকে। একে শিলাচক্র বলা হয়।

তোমার জন্য কাজ:

তুমি কিছু প্রাচীন কীর্তি কলার ফটো সংগ্রহ করো।

সেগুলো কোন্ শিলায় তৈরি হয়েছে জানতে চেষ্টা করো।

চিত্র ১.৮. শিলাচক্র

তোমার জন্য কাজ

তোমার অঞ্চলে পাওয়া বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যের নমুনা সংগ্রহ করো। শ্রেণিতে বন্ধুদের দেখাও।

এক বা একাধিক খনিজ দ্রব্য মিশে শিলা সৃষ্টি হয়। খনিজ দ্রব্যের নির্দিষ্ট ভৌতিক গুণ ও রাসায়নিক গঠন থাকে। মানব সমাজের জন্য খনিজদ্রব্যের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। কিছু খনিজ দ্রব্যকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন—কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি। লোহা, বক্সাইট ও সোনা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য শিল্পে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন রাসায়নিক সার ও ওষুধ শিল্পেও খনিজ দ্রব্যের ব্যবহার রয়েছে।

প্রশ্নাবলী

১. **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।**

(I) পৃথিবী কোন্ তিনটি স্তর দ্বারা গঠিত?

(ii) শিলা কী?

(iii) তিন প্রকার শিলার নাম লেখো।

(iv) নিঃস্রবজ আগ্নেয়শিলা কীভাবে সৃষ্টি হয়?

(v) শিলাচক্র বলতে কী বোঝায়?

(vi) শিলার কী কী ব্যবহার রয়েছে?

(vii) রূপান্তরিত শিলা কী?

২. **ঠিক উত্তর বেছে লেখো।**

(I) অর্ধতরল ম্যাগ্মা থেকে কোন্ শিলা সৃষ্টি হয়েছে?

(ক) আগ্নেয় (খ) অবক্ষিপ্ত (গ) রূপান্তরিত।

(ii) পৃথিবীর গভীরতম স্তরকে কী বলা হয়?

(ক) ভূত্বক (খ) ম্যান্টল (গ) কোর।

(iii) সোনা, পেট্রেলিয়াম ও কয়লা কী?

(ক) শিলা (খ) খনিজ (গ) জীবাশ্ম।

(iv) কোন্ শিলায় প্রায়ত জীবাশ্ম থাকে?

(ক) অবক্ষিপ্ত (খ) রূপান্তরিত (গ) আগ্নেয়

(v) কোন্ স্তরটি পৃথিবীর সবথেকে পাতলা স্তর?

(ক) ভূত্বক (খ) ম্যান্টল (গ) কোর।

৩. **স্তম্ভ দু'টির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে লেখো।**

	'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
(I)	কোর	(ক) স্লেটে পরিণত হয়।
(ii)	খনিজ দ্রব্য	(খ) রাস্তা ও গৃহ নির্মাণে ব্যবহার হয়।
(iii)	শিলা	(গ) সিলিকন ও অ্যালুমিনায় গঠিত।
(iv)	কর্দম	(ঘ) নির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠন থাকে।
(v)	সিআল	(ঙ) সবথেকে গভীরতম স্তর।

পৃথিবীর অভ্যন্তর

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয় পাঠ

ভূমিরূপ

পৃথিবীপৃষ্ঠ উভয় জল ও স্থল ভাগ দ্বারা গঠিত। বিস্তীর্ণ স্থলভাগকে মহাদেশ ও জলভাগকে মহাসাগর বলা হয়। এই মহাদেশ ও মহাসাগর গুলিই প্রথম শ্রেণীর ভূমিরূপ। মহাদেশে পর্বত, মালভূমি, ও সমতল ভূমি ইত্যাদি ভূমিরূপ দেখা যায়। সেইরকম মহাসাগরের জলরাশির নীচে মহীসোপান, মহীঢালু ও মহাসাগর সমতল আদি ভূমিরূপ রয়েছে। মহাদেশ ও মহাসাগর অন্তর্গত এই মুখ্য ভূমিরূপগুলো দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূমিরূপ। এছাড়া ভূপৃষ্ঠে উপত্যকা, জলপ্রপাত, নদীগণ্ড, অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ ও ত্রিকোণ ভূমি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ভূমিরূপ সকল দৃষ্টিগোচর হয়।এগুলি তৃতীয় শ্রেণীর ভূমিরূপ।

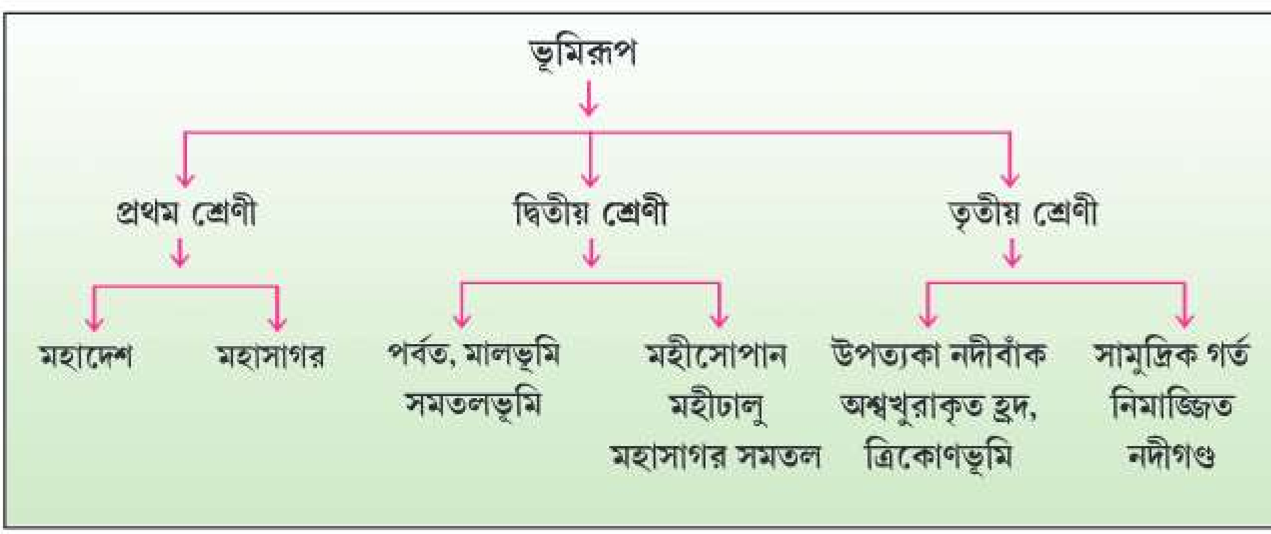

ভূচলন:

ভূপৃষ্ঠ তথা অভ্যন্তরে পরিবর্তন লেগে রয়েছে। বিভিন্ন শক্তির প্রভাবে এই পরিবর্তন সম্ভব হয়। কয়েকটি শক্তি ভূপৃষ্ঠে কার্য করে থাকে। এদেরকে **বাহ্যশক্তি** বলা হয়। ভূঅভ্যন্তরে কার্য করতে থাকা বিভিন্ন শক্তিকে **অভ্যন্তরীণ**

শক্তি বলা হয়। অভ্যন্তরীণ শক্তি মুখ্যত দু'প্রকার। কিছু শক্তির প্রভাবে হঠাৎ ভূচলন হয়ে থাকে। ভূমিকম্প, অগ্নিউদগিরণ, ভূস্খলন প্রভৃতি এই ধরনের ভূচলনের উদাহরণ। আর কিছু শক্তির প্রভাবে ধীর ভূচলন হয়ে থাকে। মহাদেশীয় সঞ্চলন তথা পর্বত গঠন প্রভৃতি ধীর ভূচলনের ফল। ভূপৃষ্ঠস্থ ভূমিরূপ উভয় অভ্যন্তরীণ শক্তি ও বাহ্যশক্তির মিলিত পরিণাম।

মহাদেশীয় সঞ্চলন:-

পৃথিবীর কঠিন ভূভাগের উপরে আমরা বসবাস করছি। এটা আমাদের স্থির ও চলন শূন্য লাগে। প্রকৃতপক্ষে উভয় স্থলভাগ ও জলভাগ সর্বদা গতিশীল। এরা অনবরত স্থান পরিবর্তন করছে। ভূবিজ্ঞানীদের মতে, কোটি কোটি বছর আগে সব মহাদেশ মিশে একটি মহাদেশ এবং সব মহাসাগর মিশে একটাই মহাসাগর ছিল। মহাদেশকে পাঞ্জিয়া এবং মহাসাগরকে পান্থালাসা বলা হত। পরবর্তী সময় পাঞ্জিয়ার মধ্যভাগে একটি সংকীর্ণ তথা অগভীর সমুদ্র সৃষ্টি হল। এটা টেথিস সাগর নামে পরিচিত। টেথিস সাগরের উত্তরে থাকা ভূখণ্ডকে আঙ্গারাল্যান্ড ও দক্ষিণে থাকা ভূখণ্ডকে গন্ডওয়ানা ল্যান্ড বলা হত। এখনকার উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশ মিশে আঙ্গারাল্যান্ড গঠিত হয়েছিল। সেইকরম, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আন্টার্টিকা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ ভারতের মালভূমি অঞ্চল মিলিতভাবে গন্ডওয়ানা ল্যান্ড গঠন করেছিল। কালক্রমে পাঞ্জিয়ার ভূভাগে ফাটল সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে ধীর ভূচলন হল। উত্তর আমেরিকা আঙ্গারাল্যান্ড থেকে ও দক্ষিণ আমেরিকা গন্ডওয়ানা ল্যান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

তুমি জানো কি?

গন্ডওয়ানা ল্যান্ড শব্দটি ভারতের এক মুখ্য আদিম অধিবাসী 'গন্ড'দের নামানুসারে দেওয়া হয়েছে।

যার ফলে আটলান্টিক মহাসাগর সৃষ্টি। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের দক্ষিণ অংশ ক্রমে আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ফলে ভারত মহাসাগরের উদ্ভব হল। এখন আমরা দেখতে থাকা স্থল ও জল ভাগের বণ্টন এই মহাদেশীয় সঞ্চালনের ফল। মহাদেশীয় সঞ্চালন এক অতি ধীর তথা নিরবছিন্ন প্রক্রিয়া। সুতরাং সময়ানুক্রমে স্থল ও জল ভাগের বণ্টনে নতুন সমীকরণের উদ্ভব সুনিশ্চিত মনে হয়।

তুমি জানো কি?

অশ্ম অর্থাৎ শিলা। পৃথিবীর ভেতরে যতদূর পর্যন্ত শিলা গঠনকারী উপাদান থাকে তাকে অশ্মমণ্ডল বলা হয়। ইহা ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত।

বিশাল মহাদেশীয় ভূখণ্ডগুলি গতিশীল হবার কারণ কী? এসব কোন্ প্রক্রিয়ার ফল? এই প্রশ্নের সমাধান সূত্র ভূবিজ্ঞানীরা বের করেছেন। তাঁদের মতে অশ্মমণ্ডল কয়েকটি বিশাল প্লেটে বিভক্ত। এই প্লেটগুলির গতিবেগ অতি ধীর। এগুলো বছরে প্রায় পাঁচ সেন্টিমিটার বা তার থেকে কম বেগে গতি করে। অশ্মমণ্ডলের নিম্নাংশে অর্ধতরল শিলা বা ম্যাগ্মা গতিশীল হওয়ায় অশ্মমণ্ডলীর প্লেটের গতি সম্ভব হয়েছে। একে প্লেট টেকটোনিকস বলা হয়। ভূঅভ্যন্তরে ম্যাগ্মা গতি করে থাকে। তোমার জন্য কাজে এই চক্র গতি সম্পর্কে বোঝানো হয়েছে।

তোমার জন্য কাজ :

তুমি একটা ছোট রঙিন কাগজ সংগ্রহ করো। একটি কাচের পাত্রে অর্ধেক জল নাও। রঙিন কাগজটা জলে ফেলো। এখন কাচের পাত্রটি স্টোভ বা উনুনের ওপর রেখে গরম করো। জল গরম হলে দেখবে যে কাগজটি উষ্ণ জলস্রোতে ওপরে উঠছে আবার ওপরের ঠান্ডা স্রোতের সঙ্গে নীচে চলে যাচ্ছে। এইভাবে ভূঅভ্যন্তরে ম্যাগমা কোথাও ঊর্ধ্বগামী আবার কোথাও নিম্নগামী হয়ে থাকে।

ভূমিকম্প:

মাঝে মাঝে পৃথিবীপৃষ্ঠ কেঁপে ওঠে। ভূপৃষ্ঠের এই কম্পনকে ভূমিকম্প বলা হয়। ভূত্বকের যে স্থানে ভূমিকম্পর উৎপত্তি হয়, তাকে ভূকম্প কেন্দ্র বলা হয়। ভূকম্প কেন্দ্র থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি তরঙ্গ আকারে চতুর্দিকে গতি করে। ভূকম্প কেন্দ্রর ঠিক উপরে ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত স্থানকে উপকেন্দ্র বলা হয়। ভূকম্পজনিত সর্বাধিক ক্ষতি এই উপকেন্দ্রেই হয়ে থাকে।

চিত্র ১.৯. ভূমিকম্পের উৎপত্তি

উপকেন্দ্র থেকে দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে ভূমিকম্পের তীব্রতা হ্রাস পায়। ভূত্বকের দুর্বল অঞ্চলে অধিক ভূমিকম্প হয়ে থাকে।

এখনও পর্যন্ত ভূমিকম্পের পূর্বানুমান সম্ভব হয়নি। তবে আমরা পূর্বে প্রস্তুত থাকলে ভূকম্পজনিত ক্ষয়ক্ষতি অনেক পরিমাণে হ্রাস হতে পারবে।

সাধারণভাবে পশুপক্ষীদের ব্যবহারিক পরিবর্তনকে লক্ষ করে স্থানীয়ভাবে ভূমিকম্পের পূর্বানুমান করা হয়ে থাকে। ভূমিকম্প হবার আগে পুকুরে মাছেরা লাফাতে থাকে। সাপেরা গর্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং গাইগরুরা ডাকতে থাকে।

তুমি জানো কি?

ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপার জন্য সিসমোগ্রাফ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপার জন্য রিখটার মান ব্যবহার করা হয়ে থাকে। রিখটার মানে ২.০ বা এর চেয়ে কম মানের ভূমিকম্প সহজে জানা যায় না। ৫.০ বা তার চেয়ে অধিক মানের ভূমিকম্পে বাড়িঘর কাঁপতে থাকে। জিনিসপত্র তাক থেকে পড়ে যায়, ইত্যাদি। ৬.০ মানের ভূমিকম্পে বাড়িঘর ভেঙে পড়ে, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। তবে রিখটার মানে ৭.০ বা তদূর্ধ্ব ভূমিকম্পে সর্বাধিক ভয়ঙ্কর ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে।

সিসমোগ্রাফ

ভূমিকম্পের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি

ভূমিকম্পের সময় কোথায় আশ্রয় নেবে–

নিরাপদ স্থান: টেবিল বা ডেস্কের নীচে, রান্নাঘরের স্ল্যাবের নীচে, ঘরের কোনো ভেতরের কোণ বা দেওয়ালে হেলান দিয়ে থাকা নিরাপদ।

দূরে থাকো: আগুনের কাছ থেকে, চিমনির নিকটবর্তী স্থান, জানালা, বড় আয়না, কাচ দিয়ে বাঁধানো ছবি বা ফটো থাকা স্থান।

প্রস্তুত থাকো: ভূমিকম্প সম্বন্ধীয় সতর্কতা বন্ধু, পরিবার তথা প্রতিবেশীদের জানাও, এধরনের কোনো বিপত্তি এলে, দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করো।

তোমার জন্য কাজ

একটি জলপূর্ণ পাত্র নাও। তার ওপর হালকা ঢাকনা দাও। জলকে গরম করো। ঢাকনার ওপর মটর, চামচ, ও কাচের গুলি রাখো। কী দেখছ? জল ফুটতে আরম্ভ করলে, ঢাকনাটা কাঁপতে থাকবে। ঢাকনার উপরে রাখা দ্রব্যগুলিও কাঁপতে থাকবে। ক্রমে মটর ও কাচের গুলি তলায় পড়ে যাবে আর চামচটা ঠনঠন শব্দ করে কাঁপতে থাকবে। এইরকম ভূকম্প হলে ভূপৃষ্ঠ দুলতে থাকে আর ক্ষয়ক্ষতি হয়।

তুমি জানো কি?

ভূকম্প কেন্দ্র থেকে তিন রকমের শক্তি তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। সেগুলো:

১. প্রাথমিক তরঙ্গ বা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ।
২. দ্বতীয়ক তরঙ্গ বা অনুপ্রস্থী তরঙ্গ।
৩. লম্ব তরঙ্গ বা পৃষ্ঠ তরঙ্গ বলা হয়।

এই তরঙ্গের বিশেষত্ব সম্বন্ধে উপর শ্রেণীর বিজ্ঞান বা ভূগোল বই থেকে জানতে চেষ্টা করো।

অগ্নি উদ্‌গিরণ:

ভূঅভ্যন্তরে শিলা অর্ধ তরল বা তরল অবস্থায় থাকে বলে আমরা জানি। ভূঅভ্যন্তরে একে ম্যাগমা বলে। ভূত্বকের কিছু স্থানে ম্যাগমা গচ্ছিত

চিত্র- ১.১০. আগ্নেয় উদ্‌গিরণ

হয়ে থাকে। তাকে ম্যাগমাকুঠুরী বলে। মাঝে মাঝে ভূত্বকের ফাটল বা দুর্বল স্থান দিয়ে ম্যাগমা বাইরে বেরিয়ে আসে। ম্যাগমার সঙ্গে বিভিন্ন কঠিন পদার্থ প্রচুর জলীয় বাষ্প ও বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থও বাইরে বেরিয়ে আসে। ভূপৃষ্ঠে ম্যাগমাকে লাভা বলা হয়। যে পথ দিয়ে ম্যাগমা বাইরে বেরিয়ে আসে তাকে গ্রীবা পথ বা নির্গম পথ বলা হয়। ভূপৃষ্ঠে থাকা গ্রীবা পথের উপর অংশকে মুখগহ্বর বলা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুখগহ্বর দিয়ে আগুন বেরোতেও দেখা যায়। যে প্রক্রিয়াতে ভূঅভ্যন্তর থেকে ম্যাগমাসহ কঠিন ও গ্যাসীয় পদার্থরা বাইরে বেরিয়ে আসে তাকে অগ্নি উদ্‌গিরণ বলা হয়। ভূপৃষ্ঠে লাভা ক্রমে জমা হয়ে আগ্নেয় পর্বত ও লাভা মালভূমি সব সৃষ্টি হয়ে থাকে।

তোমার জন্যে কাজ:

১. কোনো খবরের কাগজ (নতুন বা পুরাতন) থেকে ভূমিকম্পের খবরাখবর পড়ো। এতে ঘটে থাকা ঘটনাগুলিকে ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে লেখো।

২. মনে করো তুমি স্কুলে থাকার সময় ভূমিকম্প হল। তাহলে তুমি কোন্ নিরাপদ স্থানে যাবে?

ভাঁজ ও স্তর চ্যুতি:

বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ শক্তির প্রভাবে ভূপৃষ্ঠে কুঞ্চন ও ফাটল সৃষ্টি হয়। ফলে শিলাস্তরের উপরে উভয় পার্শ্ব থেকে বা এক পাশ থেকে চাপ পড়লে শিলা কুঞ্চিত হয়। যার ফলে শিলা স্তরের একাংশ উপরে এবং অন্য অংশটি নীচে চলে যায়। একে ভাঁজ বলা হয়। এই ভাঁজের জন্য (ভঙ্গ) ভূত্বক সংকুচিত হয়। ভঙ্গ বা ভাঁজের উপারংশকে উর্ধ্ব ভাঁজ ও নিম্নাংশকে নিম্ন ভাঁজ বলা হয়।

কছু অভ্যন্তরীণ শক্তির প্রভাবে শিলাস্তর উভয় দিকে টানা হয়ে যায়। ক্রমে ফাটলের সৃষ্টি হয়। ফাটলের উভয় পার্শ্বে থাকা শিলাস্তরে চলন হয়ে কোনো অংশ উপরে বা নীচে চলে যায়। ফলে বিভিন্ন শিলাস্তরের মধ্যে কিছু

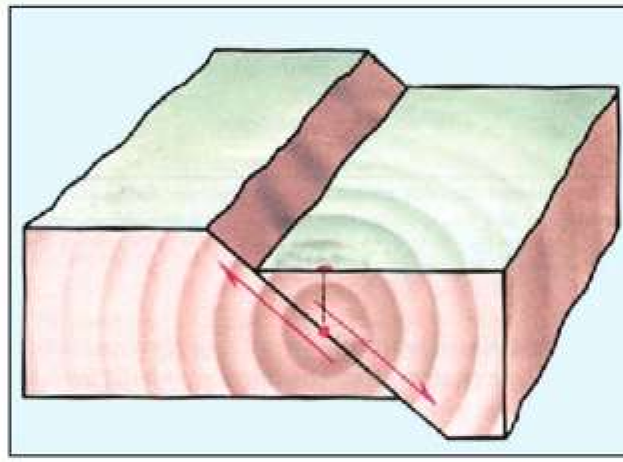

চিত্র- ১.১১. ভঙ্গ (ভাঁজ) ও স্তরচ্যুতি

ঠিকঠাক থাকে না। একে স্তরচ্যুতি বলা হয়। মাঝে মাঝে দুটি চ্যুতির মধ্যবর্তী অংশ উপরে উঠে যায়। ফলে স্তূপ পর্বত সৃষ্টি হয়। অন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে দুটি চ্যুতির মধ্যবর্তী অংশ চেপে গিয়ে গ্রস্ত উপত্যকা সৃষ্টি হয়ে থাকে। ভারতের নর্মদা ও তাপ্তী নদী দুটি এইরকম সৃষ্ট গ্রস্ত উপত্যকা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

পর্বত, মালভূমি ও সমতলভূমি:

পূর্ব আলোচনায় জেনেছি যে পর্বত, মালভূমি ও সমতল ভূমিগুলি স্থলভাগ অন্তর্গত মুখ্য ভূমিরূপ। সমতল ভূমি থেকে হঠাৎ উপরে ওঠা উচ্চভূমিগুলিকে পাহাড় বা পর্বত বলা হয়। এগুলির আধার ভূমি প্রশস্ত এবং উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে শঙ্কুর আকার হয়ে থাকে। পর্বতগুলির উচ্চতা প্রায় ৩০০ মিটার বা তদূর্ধ্ব হয়। পর্বতের সৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ শক্তির প্রভাবে কোমল স্তরীভূত শিলায় পার্শ্বচাপ হওয়ার দরুন ভঙ্গীয় পর্বত সৃষ্টি হয়। সেইরকম স্তরচ্যুতির জন্য স্তূপ পর্বত এবং অগ্নিউদ্‌গিরণে আগ্নেয় পর্বত বা সঞ্চয়জাত পর্বতের সৃষ্টি হয় বলে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। হিমালয়, আল্পস, রকি, আন্দিজ আদি ভঙ্গীয় পর্বত। এগুলো কোন্ মহাদেশে অবস্থিত? সেইরকম ভারতের সাতপুরা স্তূপ পর্বত ও জাপানের ফুজিয়ামা সঞ্চয়জাত পর্বত।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪০০ মিটার বা অধিক উচ্চতায় অবস্থিত সমপ্রায় ভূমিকে মালভূমি বলা হয়। চতুষ্পার্শ্বের সমতল ভূমি থেকে এগুলো তীক্ষ্ণ ভাবে উপরে উঠে থাকে। সুতরাং মালভূমির পাশগুলো অধিক ঢালু হয়ে থাকে। বিস্তীর্ণ টেবিলের মতো দেখায় বলে মালভূমিকে টেবিল ল্যান্ডও বলে। কিছু মালভূমির চারদিকে উঁচু পর্বত ঘিরে থাকে। পামির হচ্ছে পৃথিবীর উচ্চতম মালভূমি। একে পৃথিবীর ছাদ বলা হয়। মালভূমি ভূচলন ও অগ্নিউদ্‌গিরণ থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। ভারতের দাক্ষিণাত্য মালভূমি লাভাদ্বারা সৃষ্টি হয়েছে।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০০ মিটার বা কম উচ্চতায় থাকা বিস্তীর্ণ সমপ্রায় ভূমিকে সমতলভূমি বলা হয়। এগুলোর পৃষ্ঠ ভাগ চ্যাপটা। সমান ও অতি কম ঢালু। কিছু সমতলভূমি অভ্যন্তরীণ শক্তির প্রভাবে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এগুলোকে সংরচনাজনিত সমতলভূমি বলা হয়। আমেরিকার বৃহৎ সমতলভূমি এর এক উদাহরণ। অধিকাংশ

সমতল ভূমি অবক্ষিপ্ত পদার্থের সঞ্চয়ে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এদেরকে সঞ্চয়জনিত সমতল ভূমি বলা হয়। ভারতের গাঙ্গেয় সমতলভূমি পৃথিবীর এক বৃহৎ সঞ্চয়জনিত সমতলভূমি। তেমনি ভূমিক্ষয়ের জন্য সৃষ্টি কিছু সমতলভূমিকে ক্ষয়জনিত সমতলভূমি বলা হয়।

ভূপৃষ্ঠে পরিবর্তনকারী শক্তি:

ভূপৃষ্ঠে কার্য করতে থাকা শক্তিকে বাহ্যশক্তি বলা হয়। এই শক্তি উচ্চভূমিকে ক্ষয় করার সঙ্গে ক্ষয়জাত পদার্থকে নিম্নভূমিতে জমা করে থাকে। ভূপৃষ্ঠকে ক্রমে সমতল ভূমি বা সমপ্রায় ভূমিতে পরিণত করা এদের কাজ। একে সমানীকরণ প্রক্রিয়া বলা হয়।

ভূপৃষ্ঠে কার্যরত বাহ্যশক্তির মধ্যে নদী, হিমবাহ, পবন, ভূতল জল ও সামুদ্রিক তরঙ্গ প্রভৃতি প্রধান। চির বরফাবৃত অঞ্চলকে ছেড়ে দিলে নদী ভূপৃষ্ঠের প্রায় প্রত্যেক স্থানে কার্য করে থাকে। হিমমণ্ডল তথা বরফাবৃত উচ্চ পর্বতাঞ্চলে হিমবাহ ক্ষয়কার্য করে থাকে। মরু অঞ্চল তথা সমুদ্র কূলবর্তী অঞ্চলে পবন হচ্ছে মুখ্য ক্ষয়কারী শক্তি। চুনপাথর ও চক শিলা থাকা অঞ্চলে ভূতল জল এবং উপকূল অঞ্চলে সামুদ্রিক ঢেউ ভূরূপে পরিবর্তন এনে থাকে।

ভূপৃষ্ঠে কিছু বাহ্যশক্তি অনবরত কার্যরত। ফলে ভূমিরূপে পরিবর্তন এসে থাকে। দুটি প্রক্রিয়া যথা চূর্ণীভবন ও ক্ষয়ীকরণ দ্বারা এই পরিবর্তন হয়ে থাকে। বড় বড় শিলাখণ্ডগুলি ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হওয়াকে চূর্ণীভবন বলা হয়। চূর্ণীভূত শিলাকে নদী, হিমবাহ, পবন, ভূতল জল ও সামুদ্রিক তরঙ্গ বয়ে নিয়ে নিম্নভূমি বা সমুদ্রের তলায় জমা করে। চূর্ণীভূত শিলা ক্ষয়কারী শক্তিদের দ্বারা পরিবাহিত হবার সময় ভূপৃষ্ঠকে ক্ষয় করে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে ক্ষয়ীকরণ বলা হয়। ভূমিক্ষয় তথা ক্ষয়জাত পদার্থের সঞ্চয়ে ভূপৃষ্ঠে উভয় ক্ষয়জনিত ও সঞ্চয়জনিত ভূমিরূপ সকল সৃষ্টি হয়।

নদীর কার্য:

পৃথিবীর প্রায় সব অঞ্চলে (চির বরফাবৃত জায়গা ছাড়া) নদী ক্ষয় কার্য করে থাকে। সাধারণত পাহাড় ও পর্বতই নদীর উৎসস্থল। নদী উৎপত্তি স্থান থেকে ঢালু দিয়ে গতি করে সমুদ্রে বা হ্রদে পড়ে। নদীর ওপর মাথার ভূমি বন্ধুর ও অধিক ঢালু বিশিষ্ট। এই স্থানে নদীর গতি অত্যন্ত প্রখর। নদী তার শয্যাকে খুঁড়ে ফেলে।

চিত্র ১.১২. জলপ্রপাত

ফলে ইংরাজী) **'V'** সদৃশ উপত্যকা সৃষ্টি হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে নদী অনেক উঁচু থেকে কঠিন শিলার ওপরে লাফ দিয়ে পড়ে, একে **জলপ্রপাত** বলে।

নদী ক্রমে পার্বত্য শয্যা অতিক্রম করে সমতল শয্যায় প্রবেশ করে। শয্যায় ঢালু কম থাকায় নদীর বেগ হঠাৎ কমে যায়। নদী ওপর মাথা থেকে বয়ে আনা বালি, কাঁকর, পাথর প্রভৃতিকে পাহাড়ের নীচে হাতপাখার

তুমি জানো কি?

পৃথিবীতে হাজার হাজার জলপ্রপাত আছে। দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা দেশের অন্তর্গত অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত পৃথিবীর উচ্চতর জলপ্রপাত। অন্যান্য প্রধান জলপ্রপাতের মধ্যে আমেরিকা ও কানাডার মধ্যবর্তীর নায়েগ্রা (উত্তর আমেরিকা) এবং জাম্বিয়া ও জিম্বাবোয়ের (আফ্রিকা) মধ্যবর্তী ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত অন্যতম।

চিত্র ১.১৩. সমতল শয্যায় নদীদ্বারা সৃষ্টি ভূমিরূপ

আকারে জমা করে দেয়। একে **পটুব্যাজন** বলা হয়। সমতল শয্যার নদীর স্রোত ধীর হয়। সামান্য বাধা পেলে গতি পরিবর্তন করে আঁকবাঁকা পথে প্রবাহিত হয়। নদীর এ ধরনের আঁকাবাঁকা গতিপথকে নদীবাঁক বলা হয়।

চিত্র ১.১৪. অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ

তোমার জন্য কাজ

ত্রিকোণ ভূমি সৃষ্টি করে থাকা অন্য পাঁচটি নদীর নাম জানতে চেষ্টা করো।

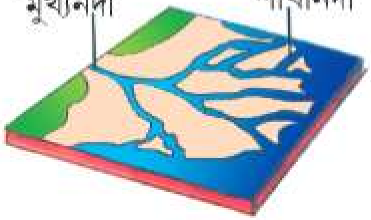

চিত্র ১.১৫. ত্রিকোণ ভূমি

নদীবাঁকের এক পাশে নদীর জল ধাক্কা খাওয়ায় সেখানে অধিক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এর ঠিক বিপরীত দিকে বালি পলিমাটি ইত্যাদি জমা হতে থাকে। ধীরে ধীরে নদীর বাঁকের উভয় মাথা পরস্পরের অতি নিকটবর্তী হয়ে থাকে। বন্যার সময় নদী ঘুরপথ পরিত্যাগ করে সোজাসুজি প্রবাহিত হয়। নদীর বাঁক একটি ক্ষুদ্র অগভীর হ্রদের আকারে রয়ে যায়। এ ধরনের হ্রদকে **অশ্বখুরাকৃতি** হ্রদ বলা হয়। ওড়িশার অংশুপা হ্রদ মহানদী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এক অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ।

বন্যার সময় নদী এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে জলপ্লাবিত করে। এই অঞ্চলে বালি, পলিমাটি প্রভৃতি ক্রমাগতভাবে জমা হয়ে সমতল গঠিত হয়। একে প্লাবনভূমি বলা হয়। অনেক বছর ধরে নদী তার উভয় পার্শ্বে অবক্ষিপ্ত পদার্থ জমা করে প্রাকৃতিক বাঁধ সৃষ্টি করে থাকে।

উপকূল অঞ্চলে ভূমির ঢাল অনেক কমে যায়। ফলে নদীর স্রোত অতি ধীর হয়ে যায়। এখানে নদী অনেক শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। এখান থেকে নদীর মোহনা পর্যন্ত এক ত্রিকোণাকার বিস্তৃত সমতল ভূমি গঠিত হয়। একে ত্রিকোণ ভূমি বলা হয়। ভারতের গঙ্গা, মহানদী গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী প্রভৃতি বড় বড় নদীর মোহনায় ত্রিকোণ ভূমি গঠিত হয়েছে।

হিমবাহর কার্য:

অতি শীতল জলবায়ু অঞ্চল তথা উচ্চ পর্বত শৃঙ্গগুলি চির তুষারাবৃত হয়ে থাকে। উপর স্তরের চাপের জন্য তুষার কণিকাগুলো ক্রমে কঠিন বরফে পরিণত হয়। অনেক বছর ধরে জমা হয়ে থাকা বরফখণ্ডগুলো ধীরে ধীরে গতি করতে আরম্ভ করে। এই প্রকার গতিশীল বরফ স্রোতকে হিমবাহ বলা হয়। হিমবাহগুলো বিশাল আকৃতির ও অধিক ওজনদার। এরা নিজেদের গতিপথে থাকা শিলাদের চূর্ণবিচুর্ণ করা সহ বড় বড় শিলাখণ্ডদের ঠেলে তলায় গড়িয়ে দেয়। হিমবাহ এভাবে ভূমিক্ষয় করে ও ক্ষয়িত পদার্থকে বয়ে নিয়ে অন্যত্র জমা করে। যার ফলে

চিত্র ১.১৬. হিমবাহ

উভয় ক্ষয়জাত ও সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়। হিমবাহ নিজের গতিপথে সমান পৃষ্ঠতল ও তীক্ষ্ণ পার্শ্ববিশিষ্ট উপত্যকা সৃষ্টি করে। ইংরাজী অক্ষর **U** সদৃশ দেখায় বলে একে ডউপত্যকা বলা হয়।

পর্বতের ঢালুতে হিমবাহ দ্বারা মাঝে মাঝে আরাম কেদারার মতো ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়ে থাকে। একে সার্ক বলা হয়। হিমবাহের বয়ে আনা ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির শিলাখণ্ডকে এর পার্শ্বে তথা অগ্রভাগে জমা করে থাকে। এই সঞ্চিত ভূমিরূপকে গ্রাব বলা হয়। হিমবাহের পাশে রেখা সদৃশ লম্বা হয়ে থাকার জন্য এগুলোকে **গ্রাবরেখা**ও বলা হয়।

চিত্র ১.১৭. সার্ক

পবনের কার্য:

পবন মরুভূমি অঞ্চলের প্রধান ক্ষয়কারী শক্তি। মরুভূমিতে পবনের গতিবেগ বেশি হয়। পবনের সঙ্গে বালি ও শিলারেণু মিশে এর ক্ষয়শক্তি বাড়িয়ে দেয়। ভূপৃষ্ঠের অল্প কিছু উচ্চতায় পবন অধিক ক্ষয় করে থাকে। উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে বালির পরিমাণ কম থাকায় ক্ষয়শক্তি কমে যায়। ফলে মরুভূমিতে ছাতুর আকারের ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর গোড়ার আধার ভূমি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, মাঝের অংশ সরু এবং উপর অংশ প্রশস্ত হয়ে থাকে। একে ছাতু শিলা বা মাশরুম রক বলা হয়। পবন বয়ে নিতে থাকা বালি ও ধুলোকণা ইত্যাদিকে এর বেগ হ্রাস পেলে জমা করে। অপেক্ষাকৃত বড় বড় বালুকারাশি মরুভূমির ভেতরে ছোটো ছোটো পাহাড়ের আকারে জমা হয়। একে বালুকাস্তূপ বলা হয়। অর্ধচন্দ্র আকৃতি বিশিষ্ট বালির পাহাড়কে বারখান বলা হয়।

চিত্র ১.১৮. বালুকা স্তূপ

পবন বয়ে নেওয়া সূক্ষ্ম ধুলোকণা মরুভূমি থেকে বহুদূরে চলে গিয়ে বায়ুর বেগ অতি কমে গেলে জমা হয়ে যায়। অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জমা হওয়া এই ধুলোকণাকে লোয়েস বলে। চীনের পশ্চিম ভাগে লোয়েস অঞ্চল রয়েছে।

সামুদ্রিক তরঙ্গ:

সামুদ্রিক তরঙ্গ উপকূল অঞ্চলে ভূমিক্ষয় ও সঞ্চয় কার্য করে থাকে। বেলা ভূমি শিলায় তরঙ্গ অনবরত ধাক্কা দেয়, ফলে শিলায় ফাটল সৃষ্টি হয়। সময়ানুক্রমে ফাটল বড় হয়। শিলার ভেতরে গুহার মতো গর্ত সৃষ্টি হয়।

চিত্র ১.১৯. ছাতুশিলা

চিত্র ১.২০. সমুদ্রতরঙ্গ দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ

একে সমুদ্র গুহা বলা হয়। সমুদ্রের ভেতরে ঢুকে যাওয়া পাহাড়, পর্বতের উভয় পার্শ্বের গুহা ক্রমশ পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়। ফলে তোরণের মতো ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়। একে সামুদ্রিক তোরণ বলা হয়। তোরণের উপর অংশ সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়ে গেলে এক প্রাচীর সদৃশ ভূমিরূপ সমুদ্রের ভেতরে রয়ে যায়। একে স্টাক বা স্তম্ভ বলা হয়। স্টাক কালক্রমে ক্ষয় হয়ে ছোটো হলে একে স্টাম্প বলা হয়। ভারতের কেরল উপকূলে স্টাক ও স্টাম্প দৃষ্টিগোচর হয়। তরঙ্গ বয়ে আনা বালি, কাঁকর প্রভৃতি জমা করে বেলাভূমি সৃষ্টি করে।

চিত্র ১.২১ উভালা

ভূতল জলের কার্য:

ভূতল জল চুনপাথর অঞ্চলের মুখ্য ক্ষয়কারী শক্তি। চুনপাথর অধিক সন্ধিযুক্ত। এই ছিদ্র দিয়ে জল ভেতরে প্রবেশ করে। ছিদ্রগুলো ক্রমে ক্ষয় হয়ে প্রশস্ত হয়ে যায়। ফলে চুনপাথর অঞ্চলের ভূমিরূপ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। ভূমির ওপর থেকে নিম্নে জল শোষিত হয়ে যাওয়া স্থানে সানাইয়ের মতো গর্ত সৃষ্টি হয়। একে ডোলাইন বলা হয়। ডোলাইন আকারে বড় হলে তাকে উভালা বলা হয়। চুনপাথর অঞ্চলে ভূমির তলায় মাঝে মাঝে বড়বড় গহ্বর সৃষ্টি হয়। একে চুনপাথর গুম্ফা বলা হয়। চুনপাথর গুহার নীচে জল বয়ে যাওয়ার দরুন সুড়ঙ্গপথ সৃষ্টি হয়। চুনপাথর অঞ্চলের নদী সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে ভূনিম্নে প্রবাহিত হয়। এই প্রকার উপত্যকাকে অদৃশ্য উপত্যকা বলা হয়।

বড় বড় চুনপাথরের গুহার ছাদ থেকে চুনমিশ্রিত জলের ফোঁটা ফোঁটা বিন্দু বিন্দু হয়ে তলায় পড়ে। চুন অংশ ভূমিতে জমা হয়ে উইঢিবির মতো চুনস্তম্ভ

চিত্র ১.২২ স্ট্যালাগমাইট

১.২৩ স্ট্যালাকটাইট

সৃষ্টি একে **স্ট্যালাগমাইট** বলা হয়। সেইরকম চুনমিশ্রিত জল গুহার ছাদ থেকে পড়ার সময় কিছু চুন অংশ ছাদে জমতে থাকে। ক্রমে এটা বড় হয়ে ছাদ থেকে ঝুড়ি নামার মতো ঝুলতে থাকে। একে **স্ট্যালাটাইট** বলা হয়।

তুমি জানো কি?

স্ট্যালাগমাইট ও স্ট্যালাক টাইট মিলিত হয়ে সৃষ্টি করা স্তম্ভকে পপকর্ণ বলা হয়।

প্রশ্নাবলী

১. **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।**

ক) মহাদেশীয় সঞ্চালন কী?

খ) প্লেটের গতির কারণ কী?

গ) স্থানীয় ভাবে ভূমিকম্পের পূর্বানুমান কীভাবে করা যায়?

ঘ) স্তরচ্যুতি কাকে বলে?

ঙ) উদাহরণ সহ বিভিন্ন প্রকার পর্বতের নাম লেখো।

চ) মালভূমি কাকে বলে?

ছ) সমানীকরণ প্রক্রিয়া কী?

জ) অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ কীভাবে সৃষ্টি হয়?

ঝ) প্রাব রেখা কী?

ঞ) বালুকা স্তূপ কীভাবে সৃষ্টি হয়?

২. **ঠিক উত্তরটি বেছে লেখো।**

(I) কোন্‌টা একটি দ্বিতীয় শ্রেণী ভূমিরূপ?

ক) জলপ্রপাত, খ) মহীসোপান, গ) মহাসাগর

(ii) কোন্‌টা পৃথিবীর ত্বরিত চলনের জন্য হয়ে থাকে?

ক) অগ্নিউদ্‌গিরণ, খ) পর্বত গঠন, গ) মহাদেশীয় সঞ্চালন।

(iii) কোন্ নদীটা প্রশস্ত উপত্যকা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে?

ক) মহানদী, খ) নর্মদা, গ) কাবেরী

(iv) উত্তর আমেরিকা কোন্ পুরাতন ভূখণ্ডের অংশ ছিল?

ক) পাস্থালাসা, খ) গন্ডওয়ানা ল্যান্ড, গ) আঙ্গারা ল্যান্ড

(v) ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থলকে কী বলা হয়?

ক) উপকেন্দ্র, খ) কেন্দ্র, গ) গ্রস্ত উপত্যকা

(vi) অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ কোথায় দেখা যায়?

ক) নদী উপত্যকা, খ) পার্বত্য ভূমি, গ) মরুভূমি

(vii) ছাতু শিলা কার দ্বারা সৃষ্টি হয়?

ক) নদী, খ) পবন, গ) হিমবাহ

(viii) কোন্‌টা সামুদ্রিক তরঙ্গ দ্বারা সৃষ্টি হয়?

ক) বেলা ভূমি, খ) প্লাবন ভূমি, গ) ত্রিকোণ ভূমি

(ix) পটুপেলি ব্যাজন পাহাড়ের কোন্ অংশে সৃষ্টি হয়?

ক) শীর্ষদেশ, খ) মধ্যঅংশ, গ) পাদদেশ

(x) চুনপাথর অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠস্থ শুষ্ক নদী উপত্যকাকে কী বলা হয়?

ক) অদৃশ্য উপত্যকা, খ) (**U**) উপত্যকা, গ) (**V**) উপত্যকা।

৩. স্তম্ভ দুটির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে লেখো।

	'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
(i)	হিমবাহ	ক) উপকূল
(ii)	ত্রিকোণ ভূমি	খ) বরফস্রোত
(iii)	বেলা ভূমি	গ) ভূতল জল
(iv)	বালুকা স্তূপ	ঘ) নদী
(v)	জলপ্রপাত	ঙ) মরুভূমি
(vi)	উভালা	চ) কঠিন শিলা

৪. কারণ দেখাও।

(i) সমতল শয্যায় নদীবাঁকের সৃষ্টি হয়।

(ii) কিছু শিলা ছাতুর আকারে।

(iii) সামুদ্রিক গুহা স্টাম্পে পরিণত হয়।

(vi) ভূমিকম্পের জন্য বাড়িঘর ভেঙে যায়।

(v) স্তর চ্যুতির জন্য গ্রস্ত উপত্যকা সৃষ্টি হয়।

৫. তোমার জন্য কাজ

প্রদত্ত ফটোচিত্রদের লক্ষ করো। এই স্বরূপগুলি নদীর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। এদের চিহ্নিত করো এবং এরা কীভাবে ক্ষয়, বা সঞ্চয় বা উভয় প্রক্রিয়াতে সৃষ্টি হয়েছে লেখো।

ফটোগ্রাফ	স্বরূপের নাম	ক্ষয়জনিত বা সঞ্চয়জনিত বা উভয়
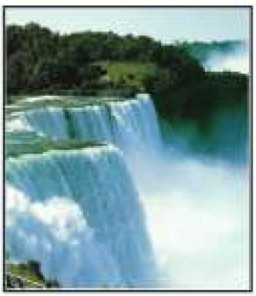		

❖❖❖

বায়ুমণ্ডল

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমাদের পৃথিবীকে চতুর্দিকে ঘিরে থাকা গ্যাসীয় বলয়কে বায়ুমণ্ডল বলা হয়। জীবজগৎ টিকে থাকার জন্য এর ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা শ্বাস ক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডল থেকে আবশ্যক অম্লজান গ্রহণ করে থাকি। বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যার ফলে আমরা অসহ্য গরম শীত থেকে রক্ষা পেয়ে থাকি।

বায়ুমণ্ডলের গঠন:

অনেকগুলি গ্যাসীয় পদার্থের মিশ্রণে বায়ুমণ্ডল গঠিত। যবক্ষারজান এবং অম্লজান এর মুখ্য উপাদান। আরগন, অঙ্গারকাম্ল, হিলিয়াম ও উদজান-এর মতো গ্যাসও বায়ুমণ্ডলে থাকে এছাড়া জলীয় বাষ্প, ধুলোকণা অল্প পরিমাণে থাকে। নিম্নোক্ত সারণি থেকে বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের আনুপাতিক উপস্থিতি লক্ষ করো।

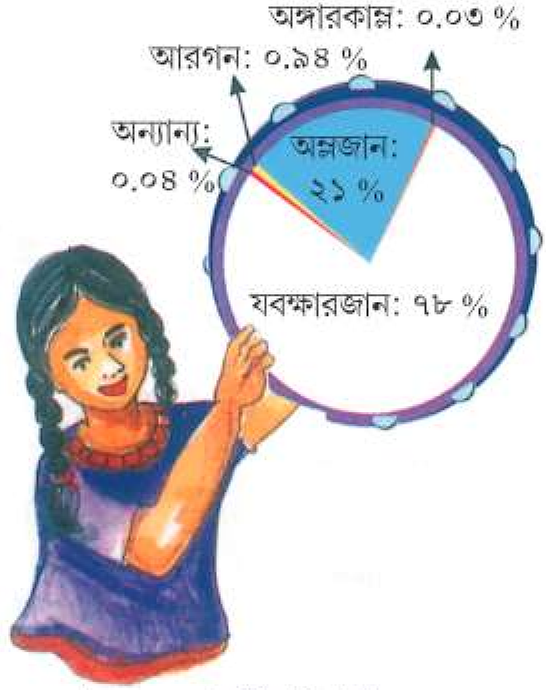

চিত্র ২.১ বায়ুমণ্ডলে গ্যাসীয় উপাদান

সারণী: ২:১

উপাদাণের নাম	:	শতকরায় পরিমাণ
যবক্ষারজান	:	৭৮ শতাংশ
অম্লজান	:	২১ শতাংশ
আরগন	:	০.৯৪ শতাংশ
অঙ্গারকাম্ল	:	০.০৩ শতাংশ
অন্যান্য গ্যাস	:	০.০৪ শতাংশ

যবক্ষারজান বায়ুমণ্ডলে সর্বাধিক পরিমাণ রয়েছে। শ্বাসক্রিয়ায় আমরা গ্রহণ করতে থাকা যবক্ষারজানকে আবার বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দিই। উদ্ভিদজগৎও একে সোজাসাপটা গ্রহণ করতে পারে না। মৃত্তিকা এবং গাছের

তুমি চিন্তা করো:

আজকাল বেশি কারখানা ও যানবাহন চলাচলের জন্য কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি জ্বালানির অধিক দহন হচ্ছে। ফলে বায়ুমণ্ডলে অঙ্গারকাম্লর মাত্রা বেড়ে চলেছে। এর প্রভাবে বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে আমাদের চতুষ্পার্শ্ব থেকে অরণ্য ধীরে ধীরে লোপ পেতে লেগেছে। বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পরিবেশের উপরে কীভাবে প্রভাব ফেলবে?

তুমি জানো কি?

পাতলা বলয়ের দ্বারা একটা স্তর অন্য স্তর থেকে আলাদা হয়েছে। ট্রপোস্ফিয়ার ও স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার এর মাঝে ট্রপোপজ, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ও মেসোস্ফিয়ারের মাঝে স্ট্র্যাটোপজ এবং মেসোস্ফিয়ার ও থার্মোস্ফিয়ারের মাঝে মেসোপজ রয়েছে।

তোমার জন্য কাজ

জুলাই মাসে নিয়মিত ১০ দিন ধরে জল হাওয়ার কী পরিবর্তন হচ্ছে লক্ষ করো এবং তোমার খাতায় লিখে রাখো।

গোড়ায় থাকা কিছু বীজাণু (ব্যাকটেরিয়া) একে পরিবর্তন করে বৃক্ষলতা উপযোগী করে তোলে।

অম্লজান বায়ুমণ্ডলের দ্বিতীয় মুখ্য গ্যাস। জীবজগৎ টিকে থাকার জন্য এটা নিতান্ত আবশ্যক। শিলাক্ষয়, ভূতল খনিজ পদার্থের গঠন ও দহন জারণ প্রক্রিয়াতে এটি সহায়ক হয়ে থাকে। জীবজগৎ শ্বাসক্রিয়ার জন্য বায়ু থেকে অম্লজান গ্রহণ করে থাকে।

বৃক্ষলতা প্রভৃতি খাদ্য প্রস্তুতের সময়ে অঙ্গারকাম্ল ব্যবহার করে থাকে। বায়ুতে অঙ্গারকাম্ল বাষ্প অতি কম পরিমাণে থাকে। সৌররশ্মি ও ভূপৃষ্ঠ থেকে বিকিরিত তাপকে এটা ধরে রাখতে পারে। ফলে বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। প্রাণীজগৎ টিকে থাকার জন্য এটা অত্যন্ত আবশ্যক।

বায়ুমণ্ডলে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের জলীয় বাষ্প ও ধূলোকণা থাকে। মেঘ, সৃষ্টি তথা জলবায়ুকে প্রভাবিত করতে এদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর:

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল ব্যাপ্ত রয়েছে। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রাকে ভিত্তি করে একে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। সেগুলো হল: ট্রপোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, মেসোস্ফিয়ার, থার্মোস্ফিয়ার এবং এক্সোস্ফিয়ার।

ট্রপোস্ফিয়ার বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর। এই স্তর পৃথিবীকে লেগে রয়েছে। এর মোটামুটি উচ্চতা প্রায় ১২ কিলোমিটার। তবে মেরু অঞ্চলে এর উচ্চতা প্রায় ৮ কিমি এবং বিষুব অঞ্চলে প্রায় ১৬ কিমি। জীবজগতের জন্য এই স্তরটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু ও আবহাওয়া সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা যথা বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, কুয়াশা, শিলাবৃষ্টি প্রভৃতি এই স্তরেই ঘটে থাকে।

ট্রপোস্ফিয়ারের ওপর স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অবস্থিত। এটা প্রায় ৫০ কিমি উচ্চতা পর্যন্ত ব্যাপ্ত রয়েছে। বিষুব বৃত্তের তুলনায় মেরু অঞ্চলে এই স্তরের বিস্তার বেশি। এই স্তরে ধূলোকণা ও জলীয় বাষ্প থাকে না। তাই মেঘ বা জলবায়ু সম্পর্কিত ঘটনা এখানে সংঘটিত হয় না। বিমান চলাচলের জন্য এটা একটি অনুকূল স্তর। এই স্তরের নিম্নাংশ ওজন গ্যাস রয়েছে। এই গ্যাস আমাদের সূর্য থেকে আসা ক্ষতিকারক রশ্মির প্রভাব থেকে রক্ষা করে।

স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের উপরে মেসোস্ফিয়ার অবস্থিত। এটা প্রায় ৮০ কিমি উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাপমাত্রা হ্রাস পেয়ে থাকে। মেসোস্ফিয়ারের উপরের স্তরকে থার্মোস্ফিয়ার বলা হয়। এটা ৮০ কিমি থেকে বায়ুমণ্ডলের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরে উচ্চতা বৃদ্ধি সহ তাপমাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এই স্তরের নিম্নভাগে আয়ন কণিকাগুলি ঘনীভূত হয়ে রয়ে থাকে। তাই এই নিম্নাংশকে আয়নস্ফিয়ার বলা হয়। এটা প্রায় ৮০ থেকে ৪০০ কিমি উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। আয়নস্ফিয়ারের জন্য দূর স্থানে বেতার তরঙ্গ প্রসারণ সম্ভব হয়।

বায়ুমণ্ডলের বাহ্যস্তরটি এক্সোস্ফিয়ার। এখানে বায়ু অতি পাতলা। হিলিয়াম ও উদজানের মতো হালকা গ্যাস এই স্তরে রয়েছে।

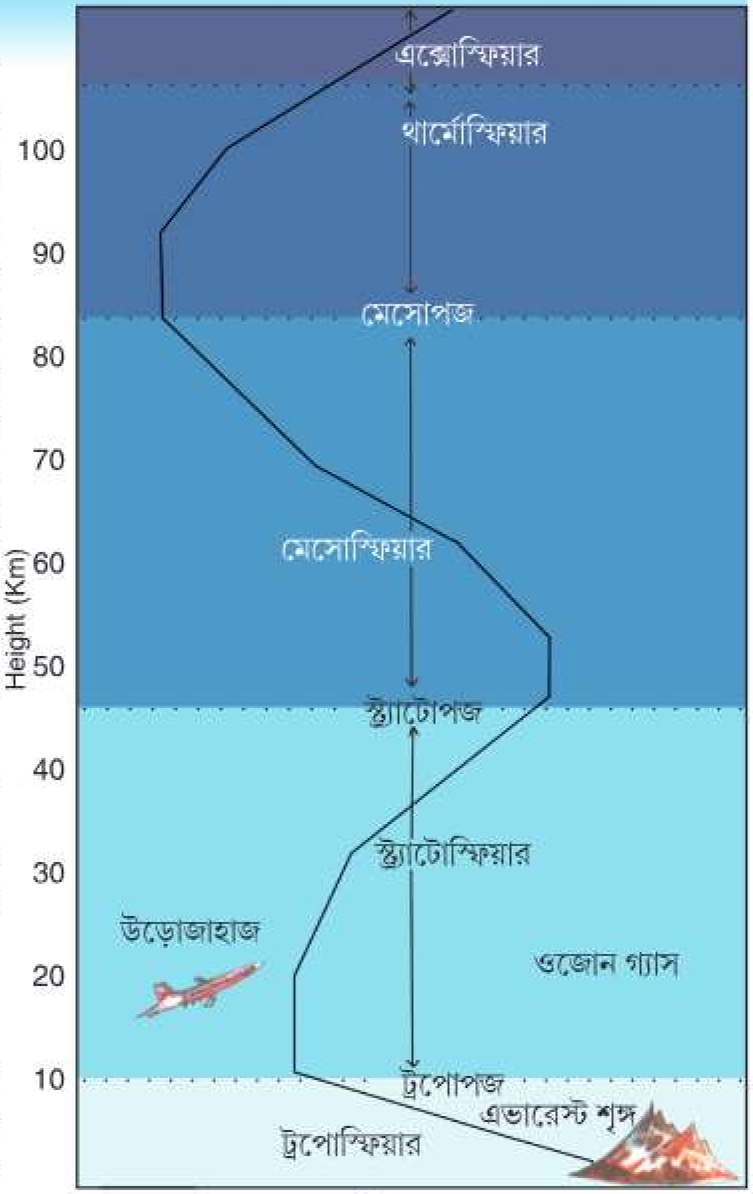

চিত্র ২.২.

আবহাওয়া ও জলবায়ু:

বায়ুমণ্ডলের অবস্থা সবসময় সমান থাকে না। কখনও প্রবল গরম হয়, আবার কখনও আকাশে মেঘ ঢেকে থাকে। আবার মাঝে মাঝে ঝড় বৃষ্টি লেগে থাকে। নির্দিষ্ট সময়ে কোনো স্থানের বায়ুমণ্ডলের সাময়িক অবস্থাকে **আবহাওয়া** বলা হয়। আবহাওয়া পরিবর্তনশীল। এটি স্থানে স্থানে তথা সময়ে সময়ে বদলায়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আবহাওয়ার পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কোনো একস্থানে এক মাথায় রোদ আছে ও অন্য মাথায় মাঝে মাঝে বৃষ্টি হতে থাকে।

কোনো স্থানের আবহাওয়ার অনেক বছরের মোটামুটি অবস্থাকে জলবায়ু বলা হয়। জলবায়ু আবহাওয়ার মতো পরিবর্তনশীল নয়। এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রায় সমান প্রকার জলবায়ু অনুভূত হয়। দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্গত ভারতীয় উপমহাদেশের জলবায়ুকে ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু বলা হয়।

তোমার জন্য কাজ

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনস প্রভৃতি দেশে কী প্রকার জলবায়ু অনুভূত হয়?

আবহাওয়া ও জলবায়ুর কারক বা নিয়ামক:

তুমি জানো কি?

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রতি ১ কিমি উচ্চতা বৃদ্ধিতে তাপমাত্রা ৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্রাস পায়। অর্থাৎ প্রতি ১৬৪ মিটার পিছু তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যায়।

তুমি জানো কি?

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানগুলি সমান। তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ এবং বায়ুচাপ প্রভৃতি উভয়ের উপাদান।

কোনো অঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ুকে অনেকগুলি নিয়ামক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কোনো স্থানের অক্ষাংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা, জল ও স্থল ভাগের বণ্টন, সামুদ্রিক স্রোত, পবনের দিক, উদ্ভিদ প্রভৃতি আবহাওয়া ও জলবায়ুকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

(ক) অক্ষাংশ: পৃথিবীপৃষ্ঠে সৌর রশ্মি সংগ্রহের পরিমাণ অক্ষাংশের উপরে নির্ভর করে থাকে। বিষুব অঞ্চলে সূর্য রশ্মি লম্বা বা সোজাভাবে পড়ে। তাই সেখানে তাপমাত্রা বেশি হয়। বিষুব বৃত্ত থেকে মেরুর দিকে তাপমাত্রা ক্রমশ হ্রাস পায়।

(খ) সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা: সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুর তাপমাত্রা বেশি থাকে। উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা হ্রাস পায়। এই কারণে মালভূমি তথা উচ্চ পর্বতের জলবায়ু শীতল। সেইরকম সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুর ঘনত্ব বেশি। তাই বায়ুর চাপও বেশি থাকে। উচ্চতা বৃদ্ধি সহ বায়ু পাতলা হয়ে যায়। ফলে বায়ুর চাপ হ্রাস পায়।

(গ) জল ও স্থল ভাগের বণ্টন: জল ও স্থল ভাগের গুণের পার্থক্য থাকে। স্থল ভাগ শীঘ্র উত্তপ্ত ও শীঘ্র ঠান্ডা হয়। মাত্র জলভাগ ধীরে ধীরে উত্তপ্ত ও বিলম্বে শীতল হয়। গ্রীষ্মকালে স্থল ভাগ উত্তপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু জলভাগ অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে। তাই সমুদ্রের প্রভাবে উপকূল অঞ্চলে বিশেষ গরম হয় না। সেইরকম শীতকালে সমুদ্র স্থলভাগের চেয়ে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ থাকে। এর প্রভাবে উপকূল অঞ্চলে বিশেষ শীত লাগে না কিন্তু সমুদ্র থেকে দূরে থাকা অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে বেশি গরম ও শীতকালে বেশি ঠান্ডা অনুভূত হয়।

(ঘ) সামুদ্রিক স্রোত: সামুদ্রিক স্রোত উষ্ণ বা শীতল হয়ে থাকে। উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত উপকূল অঞ্চলের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত উষ্ণ থাকে। আর শীতল স্রোত প্রবাহিত উপকূল অঞ্চলের জলবায়ু শীতল হয়।

(ঙ) পবনের দিক: পবনের দিক জলবায়ু ও আবহাওয়াকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। বায়ু সমুদ্রের দিক থেকে স্থলভাগে প্রবাহিত হলে অধিক জলীয় বাষ্প ধারণ করে থাকে। এটা বৃষ্টিপাত করায়। কিন্তু স্থলভাগ থেকে জলভাগে প্রবাহিত বায়ু শুষ্ক হয়। ফলে বৃষ্টিপাত হয় না।

(চ) উদ্ভিদ: উদ্ভিদ বা বৃক্ষলতা আবহাওয়া ও জলবায়ুকে প্রভাবিত করে। ঘন জঙ্গল থাকা অঞ্চলে সৌরতাপ কম হয়ে থাকে। সূর্যকিরণ ভূমিতে না পড়ার দরুন ভূমি আর্দ্র থাকে। বৃক্ষলতা বায়ুমণ্ডলকে অধিক জলীয় বাষ্প ফিরিয়ে দেয়। তাই সেখানে অধিক বৃষ্টিপাত হয়। বৃক্ষলতা কম থাকা বা মরু অঞ্চলে সূর্যকিরণ সোজা ভূমিতে পড়ে। ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। বায়ু শুষ্ক থাকায় এসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হয়ে থাকে।

জলবায়ুর উপাদান:

সৌরাভিতাপ, বায়ু, তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ, আর্দ্রতা, মেঘ ও বৃষ্টিপাত প্রভৃতি জলবায়ুর উপাদান।

সৌরাভিতাপ: সূর্য সকল শক্তির আধার। পৃথিবী ও তার বায়ুমণ্ডলের জন্য সমস্ত শক্তি সূর্যের কাছ থেকে আসে। পৃথিবীতে সংগৃহীত সৌররশ্মির পরিমাণকে সৌরাভিতাপ বলা হয়। এর পরিমাণ সাধারণভাবে বিষুবরেখা থেকে মেরুর দিকে ক্রমশ হ্রাস পায়। তবে ধাতুভেদে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়।

বায়ুর তাপমাত্রা: আমাদের প্রতিদিন অনুভব করতে থাকা উষ্ণতাই বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা। বায়ুর উষ্ণতা তথা শীতলতাকে তাপমাত্রার আকারে প্রকাশ করা হয়। ভূপৃষ্ঠ সূর্য থেকে সংগ্রহ করা তাপকে বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়। বায়ুমণ্ডলে থাকা জলীয় বাষ্প, অঙ্গারকাম্ল প্রভৃতি বাষ্প এই তাপকে গ্রহণ করে। ফলে বায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। সৌরাভিতাপের পরিমাণ বিষুবরেখা থেকে মেরুর দিকে হ্রাস পাওয়ায় বায়ুর তাপমাত্রাও সেভাবে হ্রাস পায়। তাই মেরু অঞ্চল চির বরফাবৃত হয়ে রয়েছে।

পৃথিবী প্রতিদিন সূর্য থেকে তাপ ও শক্তি সঞ্চয় করছে। তবে পৃথিবীর তাপমাত্রা মোটামুটি প্রায় স্থির রয়েছে। এটা কীভাবে হচ্ছে? পৃথিবী দিনের বেলায় সূর্যের কাছ থেকে সংগ্রহ করা তাপকে রাত্রিবেলায় বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়। বায়ুমণ্ডল থেকে এই শক্তি মহাশূন্যে চলে যায়। সুতরাং শক্তি সংগ্রহ ও শক্তি বিকিরণের মধ্যে সমতা থাকে। একে পৃথিবীর **'তাপবাজেট'** বলা হয়।

প্রতিদিন বায়ুর তাপমাত্রায় ধারাবাহিক হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। দিনে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে অপরাহ্নে সর্বাধিক ও রাত্রে ক্রমশ হ্রাস পেয়ে ভোরে সর্বনিম্নে পৌঁছয়। তাপমাত্রার এই হ্রাস-বৃদ্ধিকে দৈনিক তাপচক্র বলা হয়।

দৈনিক তাপমাত্রার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ব্যবধানকে দৈনিক তাপ ব্যবধান বলা হয়। সেইভাবে বাৎসরিক ভিত্তিতে গ্রীষ্মে সর্বাধিক ও শীত

তুমি কি জানো?

বিষুব বা নিরক্ষ অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলে প্রবাহিত সামুদ্রিক স্রোত উষ্ণ এবং মেরু অঞ্চল থেকে বিষুব অঞ্চলে প্রবাহিত সামুদ্রিক স্রোত শীতল হয়। ইউরোপের পশ্চিম উপকূলে প্রবাহিত উত্তর আটলান্টিক ধীরস্রোত এক উষ্ণ স্রোত।

এর প্রভাব থেকে সেই অঞ্চল বছরের অধিকাংশ সময় বরফমুক্ত থাকে। কানাডার পূর্ব উপকূলে প্রবাহিত লাব্রাডর শীতল স্রোতের জন্য সেই অঞ্চলের তাপমাত্রা যথেষ্ট হ্রাস পেয়ে থাকে। পরবর্তী অধ্যায়ে এই স্রোতের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

তোমার জন্য কাজ:

খবরের কাগজ বা দূরদর্শন থেকে জুলাই ও জানুয়ারি মাসের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সংগ্রহ করে তুলনাত্মক সারণি একটি প্রস্তুত করো। মাসের শেষে একটি বিবরণী প্রস্তুত করে শিক্ষককে দেখাও। এই কাজটি তুমি দলবদ্ধভাবেও করতে পারবে।

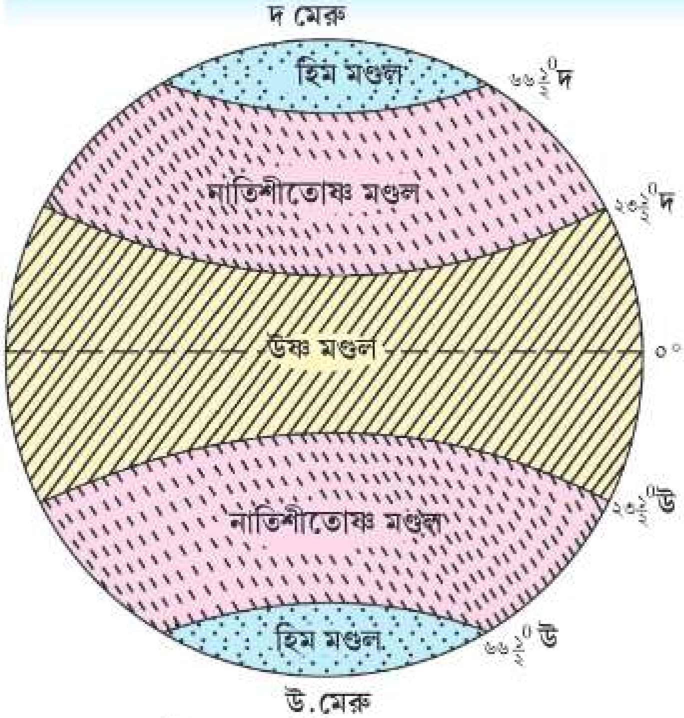

চিত্র ২.৩. পৃথিবীর তাপমণ্ডল

ঋতুতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা অনুভূত হয়। বছরের মধ্যে তাপমাত্রার ক্রমশ হ্রাস-বৃদ্ধিকে 'বার্ষিক তাপচক্র' বলা হয়। বছরের উষ্ণতম এবং শীতলতম মাসদ্বয়ের গড় তাপমাত্রার ব্যবধানকে **বার্ষিক তাপ ব্যবধান** বলা হয়। থার্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্রের দ্বারা বায়ুর তাপমাত্রা নির্ণয় করা হয়।

পৃথিবীপৃষ্ঠে সৌররশ্মি পতনের পরিমাণ বিষুব বৃত্তের থেকে মেরুর দিকে কম হয়। একে দৃষ্টিতে রেখে পৃথিবীকে পাঁচটি তাপমণ্ডলে বিভক্ত করা হয়েছে। অক্ষাংশ রেখা দ্বারা তাপমণ্ডলের সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছে।

উত্তর গোলার্ধের ২৩½° সমাক্ষরেখা থেকে দক্ষিণ গোলার্ধের ২৩½° সমাক্ষরেখার মধ্যে সূর্যকিরণ লম্বালম্বি পড়ে। তাই এখানে অত্যধিক গরম অনুভূত হয়। এ অঞ্চলকে গ্রীষ্মমণ্ডল বা উষ্ণমণ্ডল বলা হয়। কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির মধ্যে অবস্থিত এই অঞ্চলকে ক্রান্তিমণ্ডলও বলা হয়।

কর্কটক্রান্তি থেকে সুমেরু বৃত্ত (৬৬½°উ) এবং মকরক্রান্তি থেকে কুমেরু বৃত্তের (৬৬½° দ) মধ্যে তির্যক সূর্যকিরণ পড়ে। এ অঞ্চলে অধিক গরম বা অধিক শীত অনুভূত হয় না। এ অঞ্চল উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে যথাক্রমে উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল এবং দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল ভাবে পরিচিত।

উভয় গোলার্ধে মেরুবৃত্ত থেকে মেরুর মধ্যে সূর্যকিরণ তির্যকভাবে পড়ে। তাই এই অঞ্চলের বায়ুর তাপমাত্রা কম হেতু ভূমি বরফাচ্ছন্ন থাকে। এই অঞ্চলকে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে যথাক্রমে উত্তর হিমমণ্ডল ও দক্ষিণ হিমমণ্ডল বলা হয়।

তুমি জানো কি?

বায়ুর চাপকে মিলিবার এককে প্রকাশ করা হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুচাপ ১০১৩ মিলিবার। এটা বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক বায়ুচাপ।

বায়ুমণ্ডলের চাপ:

বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় পদার্থগুলি হালকা হলেও তাদের ওজন আছে। ফলে বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠে চাপ ফেলে। আমাদের শরীরের উপরেও বায়ুমণ্ডল চাপ দেয়। তবে শরীর মধ্যস্থ বিপরীতমুখী বায়ুর চাপের জন্য এটা আমরা জানতে পারি না। সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুর চাপ সর্বাধিক এবং উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে

বায়ু পাতলা হয়ে যাওয়াতে বায়ুর চাপ হ্রাস পায়। কোনো স্থানের এক বর্গ সেমি পরিমিত অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলের শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুস্তম্ভের ওজনকে বায়ুচাপ বলা হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠে এটা প্রায় ১.০৫ কিলোগ্রাম। বায়ুচাপ তাপমাত্রার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। উষ্ণ বায়ু হালকা তাই সেখানে চাপ কম। শীতল বায়ু ওজনদার। তাই বায়ুচাপ বেশি হয়।

গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বেশি থাকায় বায়ুচাপ কম হয়ে থাকে। শীতকালে তাপমাত্রা কম হওয়াতে বায়ুচাপ বৃদ্ধি পায়। ব্যারোমিটার বা চাপমান যন্ত্র দ্বারা বায়ুচাপ নির্ণয় করা হয়।

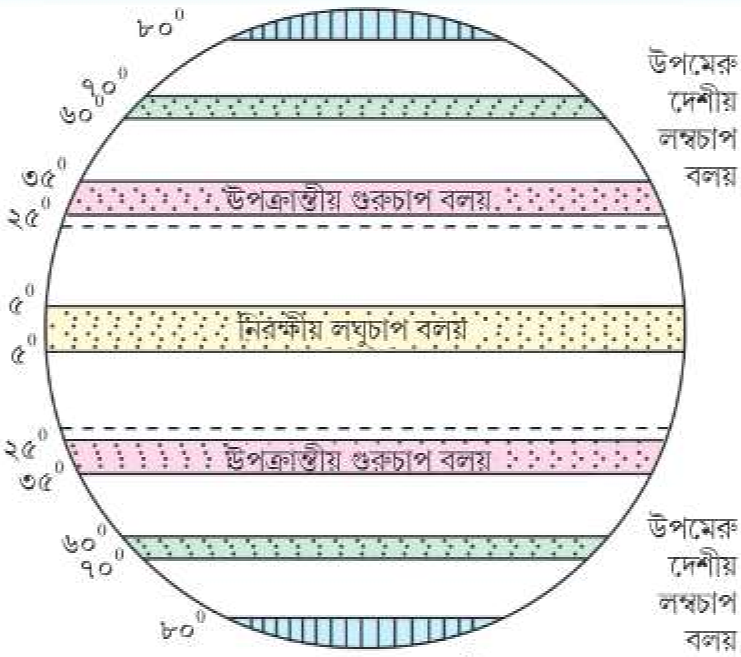

চিত্র ২.৪. পৃথিবীর মুখ্য চাপ বলয়

পৃথিবীর মুখ্য চাপ বলয়:

বায়ুর চাপ বেশি হলে গুরুচাপ এবং কম হলে লঘুচাপ হয়ে থাকে। পৃথিবীপৃষ্ঠে তাপমাত্রার ভিন্নতার জন্য বায়ুচাপে পার্থক্য থাকে। এই দৃষ্টিতে পৃথিবীকে সাতটি চাপবলয়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

(ক) নিরক্ষীয় লঘু চাপ বলয়: নিরক্ষবৃত্তের উভয় পার্শ্বে ৫° সমাক্ষরেখার মধ্যে সারা বছর সূর্যকিরণ লম্বালম্বিভাবে পড়ে। ফলে তাপমাত্রা বেশি থাকে ও বায়ুর চাপ কম হয়। একে নিরক্ষ লঘু চাপ বলয় বলা হয়। এখানে বায়ুমণ্ডল শান্ত ও চলনশূন্য। তাই একে নিরক্ষ শান্ত বলয়ও বলা হয়। এই অঞ্চলে প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

(খ) উপক্রান্তীয় গুরু চাপ বলয়: নিরক্ষ অঞ্চলের ঊর্ধ্বগামী বায়ু উভয় গোলার্ধের মেরুর দিকে গতি করে। ফলে প্রসারিত হয়ে শীতল ও ভারী হয়। এই ভারী বায়ু উভয় গোলার্ধে প্রায় ২৫° থেকে ৩৫° সমাক্ষরেখার মধ্যে নিম্নগামী হয়। ফলে এ অঞ্চলে গুরু চাপ সৃষ্টি হয়। একে উপক্রান্তীয় গুরু চাপ বলয় বলা হয়। এ অঞ্চলের বায়ু সর্বদা নিম্নগামী। এখানে বায়ুর পার্শ্ব প্রবাহ থাকে না। তাই একে উপক্রান্তীয় শান্ত বলয় বলা হয়।

(গ) উপমেরু দেশীয় লঘু চাপ বলয়: পৃথিবীর আবর্তনের বেগ দুই মেরুবৃত্ত

ক্রান্তীয় অঞ্চলের দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ফলত এই অঞ্চলে বায়ু পাতলা হয়ে লঘু চাপ সৃষ্টি করে। একে উপমেরু দেশীয় লঘু চাপ বলয় বলা হয়।

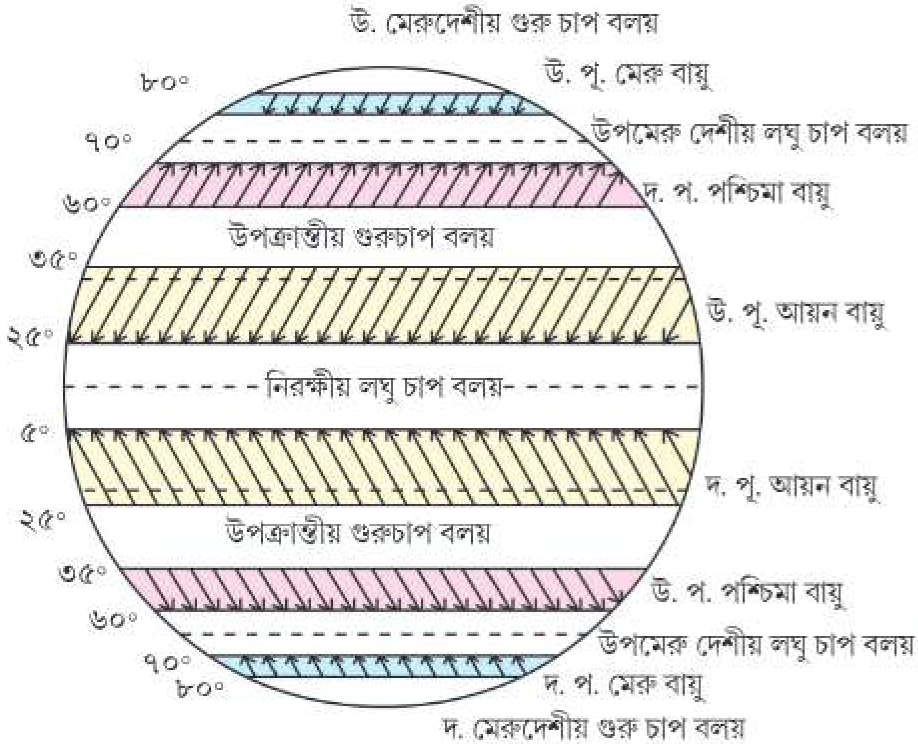

চিত্র ২.৫. নিয়ত বায়ুপ্রবাহ

অঞ্চলে অধিক। এই কারণে উভয় গোলার্ধে ৬০° থেকে ৭০° সমাক্ষরেখার মধ্যে বায়ু **(ঘ) মেরু দেশীয় গুরু চাপ বলয়:** মেরু অঞ্চল সর্বদা বরফাচ্ছন্ন। তাই বায়ু শীতল ও ওজনদার। ফলে এখানে গুরু চাপ সৃষ্টি হয়। উত্তর গোলার্ধে এটা উত্তর মেরু দেশীয় গুরু চাপ বলয় এবং দক্ষিণ গোলার্ধে এটা দক্ষিণ মেরু দেশীয় গুরু চাপ বলয় নামে পরিচিত।

বায়ুপ্রবাহ:

গতিশীল বাষ্পকে বায়ুপ্রবাহ বলে। সমতা রক্ষা করা বায়ুর ধর্ম। অর্থাৎ বায়ু সর্বদা গুরু চাপ অঞ্চল থেকে লঘু চাপ অঞ্চলে প্রবাহিত হয়ে থাকে। প্রবাহিত বায়ুর সম্বন্ধে আলোচনার সময় এর দিক ও বেগকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। উইন্ডভেন দ্বারা বায়ুর দিক ও আনিমোমিটার দ্বারা বায়ুর বেগ মাপা হয়। ভূপৃষ্ঠ সহ সমান্তরাল ভাবে বইতে থাকা বায়ুকে পবন বলা হয়। নিম্ন বা ঊর্ধ্বমুখী বায়ু বায়ুস্রোত নামে পরিচিত। সমস্ত বায়ুপ্রবাহ প্রধানত চার শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা: নিয়ত বায়ুপ্রবাহ, সাময়িক বায়ুপ্রবাহ, স্থানীয় বায়ুপ্রবাহ ও আকস্মিক বায়ুপ্রবাহ

তুমি কি জানো?

আয়ন বায়ু ক্রান্তি অঞ্চলের বৃহৎ স্থলভাগের পূর্ব পার্শ্বে প্রথমে বাধা পায় ও বৃষ্টি করায়। পশ্চিম পার্শ্বে বায়ু শুষ্ক হয়ে যাওয়ায় বৃষ্টি করাতে পারে না। ফলে মরুভূমি সৃষ্টি হয়। ভারতের থর ও আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি এর উদাহরণ।

(i) **নিয়ত বায়ুপ্রবাহ:** গুরু চাপ বলয় থেকে লঘু চাপ বলয়ে প্রবাহিত নিয়মিত বায়ুকে নিয়ত বায়ুপ্রবাহ বলে। এই বায়ুপ্রবাহ স্থায়ী। আয়ন বায়ু, পশ্চিমা বায়ু ও মেরু বায়ু এই শ্রেণীর বায়ুপ্রবাহ। উপক্রান্তীয় গুরু চাপ বলয় থেকে লঘু চাপ বলয়ে প্রবাহিত বায়ুকে আয়ন বায়ু বলা হয়। পৃথিবীর আবর্তনের জন্য বায়ু উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়।

উভয় গোলার্ধ উপক্রান্তীয় গুরু চাপ বলয় থেকে উপমেরু দেশীয় লঘু চাপ বলয় প্রবাহিত বায়ুকে পশ্চিমা বায়ু বলা হয়। পৃথিবীর ঘূর্ণনের জন্য এটি উত্তর গোলার্ধে যথাক্রমে পশ্চিম দিক থেকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তর পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ুর বেগ ও দিক পরিবর্তনশীল। তাই একে পরিবর্তনশীল পশ্চিমা বায়ু বলা হয়।

দক্ষিণ গোলার্ধের বিস্তীর্ণ জলরাশির উপরে (প্রায় ৪০০ থেকে ৪৯০ সমাক্ষরেখার মধ্যে) এই বায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়ে থাকে। গর্জনশীল এই বায়ুকে 'গর্জনশীল চালিশা' বলা হয়।

উভয় গোলার্ধে মেরু দেশীয় গুরু চাপ বলয় থেকে উপমেরু দেশীয় লঘু চাপ বলয়ে প্রবাহিত বায়ুকে মেরু বায়ু বলা হয়। এটি উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে যথাক্রমে উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব থেকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু অত্যন্ত শীতল ও শুষ্ক।

(ii) সাময়িক বায়ুপ্রবাহ: দিন বা বছরের সময়ের ভিত্তিতে পরস্পর বিপরীত দিক থেকে প্রবাহিত বায়ুকে সাময়িক বায়ুপ্রবাহ বলে। সমুদ্রবায়ু, স্থলবায়ু এবং মৌসুমি বায়ু এর উদাহরণ।

সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ু অনুভূত হয়। দিনের বেলা স্থলভাগ সমুদ্রের জলের চেয়ে শীঘ্র গরম হয়। স্থলভাগস্থ বায়ু গরম, হালকা হয়ে লঘু চাপ সৃষ্টি হয়। সমুদ্র উপরিস্থ বায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল থাকায় গুরু চাপ হয়ে থাকে। তাই সমুদ্র থেকে স্থলভাগে বায়ুপ্রবাহ হয়। এটি সমুদ্র বায়ু। এর প্রভাব প্রায় ২৫ কিলোমিটার পর্যন্ত অনুভূত হয়।

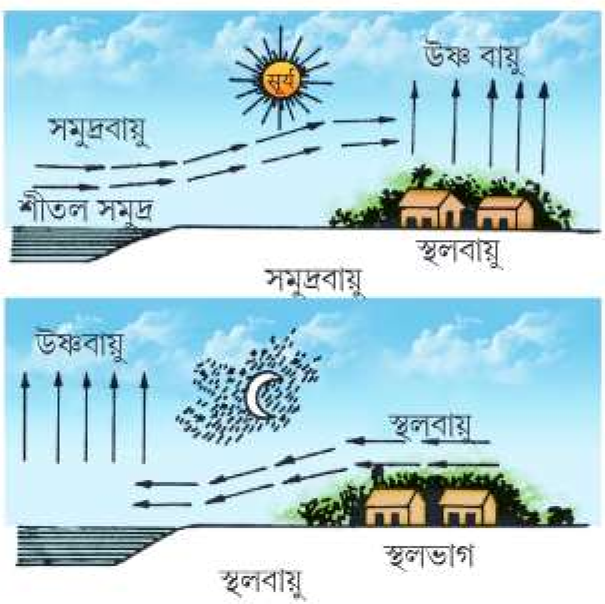

চিত্র - ২.৬ সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ু

তুমি জানো কি?

পশ্চিমা বায়ু ভূখণ্ডের পশ্চিম পার্শ্বে বৃষ্টিপাত করায়। স্থলভাগের পূর্ব পার্শ্ব বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত থাকে। এই কারণে মরুভূমির সৃষ্টি হয়। তুরান ও গোবি মরুভূমি এর উদাহরণ।

তুমি জানো কি?

বাতাবর্তকে চীন উপকূলে টাইফুন, মেক্সিকো ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের উপকূলে হ্যারিকেন, ভারত উপকূলে সাইক্লোন বলে। ১৯৯৯ সালের ২৯ অক্টোবর তারিখে আমাদের ওড়িশায় এক মহাবাত্যা সংগঠিত হয়েছিল। এর জন্যে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার বেগে ঝড় হওয়ার সঙ্গে সাত থেকে দশ মিটার উঁচু প্রবল জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। যার ফলে রাজ্যের ১৩ লক্ষ লোক বিপন্ন হয়েছিল। জগৎসিংপুর, মাজপুর, ভদ্রক, কটক, বালেশ্বর প্রভৃতি জেলায় ব্যাপক ধন, জীবনহানি হয়েছিল।

রাত্রিবেলা এই অঞ্চলে দিনের বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাই স্থলভাগ থেকে অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। একে স্থলবায়ু বলা হয়। সমুদ্রতীরের জেলেরা স্থলবায়ুর সহায়তা নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। বিকেল বেলায় সমুদ্রবায়ুর সহায়তা নিয়ে কূলে ফিরে আসে।

সাধারণত দক্ষিণ তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়। এটি একটি ঋতুকালীন বায়ু। গ্রীষ্মকালে এশিয়া ভূখণ্ডের অভ্যন্তর অঞ্চল উত্তপ্ত হয়ে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। এই বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হওয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিমে মৌসুমি বায়ু নামে পরিচিত।

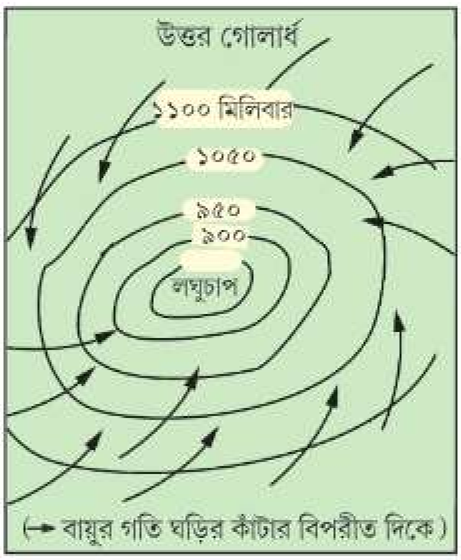

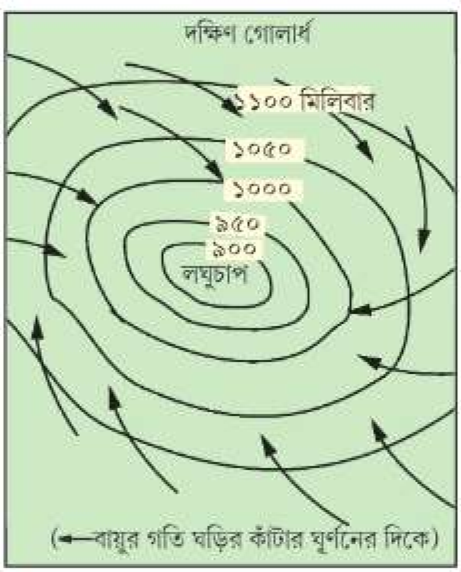

চিত্র ২.৭. বাতাবর্তে বায়ুর প্রবাহ

শীত ঋতুতে গ্রীষ্ম ঋতুর বিপরীত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ জলভাগের উপরে লঘুচাপ এবং স্থলভাগের উপরে গুরুচাপ হয়। তাই স্থলভাগের শুষ্ক বায়ু জলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। এটাই উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু।

(iii) **স্থানীয় বায়ু প্রবাহ:** অঞ্চলের ভিত্তিতে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে প্রবাহিত বায়ুকে স্থানীয় বায়ুপ্রবাহ বলে। লু, চিনুক, কালবৈশাখী প্রভৃতি এই শ্রেণীর বায়ুপ্রবাহ।

আমাদের ওড়িশার উত্তরভাগ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বাংলাদেশে গ্রীষ্মের দিনে অপরাহ্নে এক অতি উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়। এর প্রভাবে অপরাহ্নে বজ্রপাত সহ বৃষ্টি হয়। একে কালবৈশাখী বলে। এই সময় গাঙ্গেয় সমতলভূমি ও রাজস্থানে অতি উষ্ণ ও শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত হয়। একে 'লু' বলা হয়।

রকি পর্বতমালার পূর্বে ঢালু অঞ্চলে শীতকালে এক উষ্ণ ও শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত হয়। একে চিনুক বলা হয়।

(iv) **আকস্মিক বায়ুপ্রবাহ:** মাঝে মাঝে বায়ুর চাপে আকস্মিক পরিবর্তনের জন্য বায়ুপ্রবাহ হয়ে থাকে। এটাই আকস্মিক বায়ুপ্রবাহ। বাতাবর্ত ও প্রতীক বাতাবর্ত এর উদাহরণ।

কোনো স্থানের বায়ুর চাপ হঠাৎ হ্রাস পেয়ে কেন্দ্রীভূত হলে, সেই স্থানে চতুস্পার্শ্বস্থ গুরুচাপ অঞ্চল থেকে বায়ু তীব্র বেগে প্রবাহিত হয়। কেন্দ্রস্থ নিম্নচাপ অঞ্চলে প্রবেশ করতে না পেরে ঘুরে ঘুরে উপরে উঠে যায়। একেই বাতাবর্ত বলা হয়। উত্তর গোলার্ধে বাতাবর্তের

কেন্দ্রের দিকে বায়ু প্রবাহিত হওয়ার সময় ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়। অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার ঘোরার দিকে বায়ুপ্রবাহ হয়ে থাকে।

উৎপত্তি অনুযায়ী বাতাবর্ত দু প্রকার হয়।

যথা: ক্রান্তিমণ্ডলীয় ও নাতিশীতোষ্ণ বাতাবর্ত।

প্রতীপ বাতাবর্ত বাতাবর্তর ঠিক বিপরীত অবস্থা। কোনো স্থানে বায়ুর চাপ হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে গুরু চাপ কেন্দ্র সৃষ্টি হয়। এই গুরু চাপের কেন্দ্র থেকে বায়ু ধীরে ধীরে চারপাশে থাকা অল্প চাপের দিকে প্রবাহিত হয়। উত্তর গোলার্ধে এই বায়ু ডাইনে বেঁকে গিয়ে ঘড়ির কাঁটার ঘোরার দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাঁয়ে বেঁকে গিয়ে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়। প্রতীপ বাতাবর্তের জন্য আবহাওয়া শুষ্ক থাকে ও আকাশ মেঘমুক্ত থাকে।

চিত্র ২.৮ প্রতীপ বাতাবর্তে বায়ুপ্রবাহ

বায়ুর আর্দ্রতা:

ভূপৃষ্ঠের জলরাশি ও তুষাররাশি থেকে জল বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুতে মেশে। বাষ্পীভূত জলকণাগুলিকে জলীয় বাষ্প বলা হয়। জল গ্যাসীয় অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বাষ্পীভবন বলা হয়। বৃক্ষলতার ডালপাতা থেকে জল বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মেশে। একে বাষ্পমোচন প্রক্রিয়া বলে। ঘন অরণ্য অঞ্চল থেকে বহু মাত্রায় বাষ্প বায়ুতে মিশে থাকে।

বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া সূর্যতাপের পরিমাণ, বায়ুর শুষ্কতা, পবনের বেগ ও জলের সুলভতার উপরে নির্ভরশীল। নিম্ন অক্ষাংশে প্রখর সূর্যতাপের জন্য বাষ্পীভবনের হার অধিক। শুষ্ক বায়ু অধিক জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারে। বায়ুর বেগ বাষ্পীভবন ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে থাকে। মহাসাগরের বিস্তীর্ণ জলরাশি বাষ্পীভবনের উত্তম ক্ষেত্র।

বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এটা বৃষ্টিপাতের কারণও বটে। জলীয় বাষ্পর উপস্থিতি ও পরিমাণকে বায়ুর আর্দ্রতা বলা হয়। এক নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বায়ু

নির্দিষ্ট পরিমাণে জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারে। তাপমাত্রা অনুযায়ী বায়ুতে ক্ষমতা পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকলে তাকে পরিপৃক্ত বায়ু বলা হয়। জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতার চেয়ে জলীয় বাষ্প থাকলে তাকে অপরিপৃক্ত বায়ু বলা হয়। হাইগ্রোমিটার নামক যন্ত্র দ্বারা বায়ুর আর্দ্রতা মাপা হয়।

ঘনীভবন: ঘনীভবন বাষ্পীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় জলীয় বাষ্প গ্যাসীয় অবস্থা থেকে তরল বা কঠিন অবস্থায় ফিরে আসে। ঘনীভবনের জন্য বায়ু ঠান্ডা হওয়া আবশ্যক। যে তাপমাত্রায় জলীয় বাষ্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণাতে পরিণত হয়, সেই তাপমাত্রাকে 'শিশিরাঙ্ক' বলা হয়। অতএব শিশিরাঙ্ক তাপমাত্রা থেকে ঘনীভবন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। এর ফলে শিশির, কুয়াশা, মেঘ প্রভৃতি সৃষ্টি হয়।

ঘনীভবন প্ররূপ:

শিশির: হেমন্ত ও শীত ঋতুতে রাত্রিবেলা তাপ বিকিরণ করে ভূপৃষ্ঠ শীতল হয়ে যায়। শীতল ভূপৃষ্ঠে লেগে থাকা বায়ুও শীতল হয়। শীতল হওয়ায় বায়ুর তাপমাত্রা শিশিরাঙ্কের নীচে চলে যায়। ফলে জলীয় বাষ্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুর আকারে ঘনীভূত হয়। এগুলো শীতল পদার্থ বা ঘাসে লেগে থাকে। একেই শিশির বলা হয়। লম্বা শীতরাত্রি, নির্মল আকাশ এবং স্থির বায়ু শিশির সৃষ্টির জন্য অনুকুল।

তুমি জানো কি?

উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের অন্তর্গত নিউ ফাউন্ডল্যান্ড উপকূলে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের জাপান উপকূলে শীতল স্রোত ও উষ্ণ স্রোতের মিলন ঘটে। ফলে অভিবহন কুয়াশা সৃষ্টি হয়।

কুয়াশা: শীতকালে পৃথিবী তাপ বিকিরণ করে ঠান্ডা হয়। তখন পৃথিবীতে লেগে থাকা বায়ুও ঠান্ডা হয়। বায়ুর তাপমাত্রা শিশিরাঙ্কের নীচে গিয়ে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়। বায়ুতে ভাসমান অবস্থায় থাকা ধুলোকণা আশ্রয় করে এগুলো ভূপৃষ্ঠের অল্প উচ্চতায় ভেসে বেড়ায়। জলীয় বাষ্পের এই পরিবর্তিত রূপকে কুয়াশা বলে। ভূপৃষ্ঠের তাপ বিকিরণ থেকে সৃষ্টি হওয়ায় একে বিকিরণ কুয়াশা বলে। এর জন্য লম্বা শীত রাত্রি, নির্মল আকাশ ও ধীর বায়ুপ্রবাহ আবশ্যক। শীতল বায়ু ও উষ্ণ আর্দ্র বায়ুর মিশ্রণেও কুয়াশা সৃষ্টি হয়। একে 'অভিবহন' কুয়াশা বলে। কুয়াশা খুব পাতলা হলে তাকে 'মিষ্ট' বলা হয়।

তোমার জন্য কাজ

শীতকালে সকালবেলায় ঘন কুয়াশা হলে কী সুবিধা ও অসুবিধা হয় তোমার খাতায় লিখে রাখো।

মেঘ: আকাশে ভাসমান অবস্থায় থাকা জলকণা ও তুষারকণার সমাহারকে মেঘ বলা হয়। কোনো কারণে বায়ু উর্ধ্বগামী হলে প্রসারিত হয়ে ঠান্ডা হয়। ফলে এতে থাকা জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে জলকণায় পরিণত হয়। এগুলো খুব হালকা হওয়ায় আকাশে ভাসমান অবস্থায় থাকে।

আকার অনুসারে মেঘ দুই প্রকার। যথা: স্তরীভূত মেঘ ও পুঞ্জীভূত মেঘ। আকাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্তরে স্তরে ভাসতে থাকা মেঘকে স্তরীভূত মেঘ বলা হয়। এগুলো খুব পাতলা এবং এতে জলকণার পরিমাণ কম থাকে। কিছু মেঘ তুলোর গাদার মতো থোকা থোকা হয়ে অনেক উপরে দেখা যায়। এদের পুঞ্জীভূত মেঘ বলা হয়। এতে জলকণার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে।

উচ্চতা অনুসারে মেঘ তিনভাগে বিভক্ত। যথা: নিম্ন মেঘ, মধ্য মেঘ ও উচ্চ মেঘ। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার পর্যন্ত উচ্চতায় থাকা মেঘকে নিম্ন মেঘ বলা হয়। সেই রকম দুই কিমি থেকে ছয় কিমি উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত মেঘকে মধ্য মেঘ বলা হয়। এর উপরে ১২ কিলোমিটার পর্যন্ত থাকা মেঘকে উচ্চ মেঘ বলা হয়। নিম্ন মেঘে জলকণা বেশি থাকায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

বর্ষণ: মেঘে থাকা জল কিংবা তুষারকণা ঘনীভূত হয়ে নীচে পড়ার প্রক্রিয়াই বর্ষণ। এটা একটা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। বৃষ্টিপাত, তুষারপাত এবং করকাপাত এর উদাহরণ।

তোমার জন্য কাজ

তোমার অঞ্চলে একটি সপ্তাহে কবে কত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হচ্ছে, তোমার খাতায় লিখে রাখো। এর জন্য খবরের কাগজ দেখো। এর একটি বিবরণী প্রস্তুত করে শিক্ষককে দেখাও।

বৃষ্টিপাত:

মেঘে থাকা জলকণা ঘনীভূত হয়ে জলবিন্দুর আকারে ভূপৃষ্ঠে পড়াকে বৃষ্টিপাত বলা হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ রেনগেজ বা বৃষ্টিমাপক যন্ত্রে মাপা হয়। বৃষ্টিপাত তিন প্রকার। যথা: পরিচলন বৃষ্টিপাত, শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত এবং বাতাবর্ত বৃষ্টিপাত।

পরিচলন বৃষ্টিপাত: সৌরকিরণ দ্বারা ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হওয়ার দ্বারা নিম্নস্তরের বায়ু উত্তপ্ত হয়। এটা হালকা হয়ে ওপরে উঠে যায়। একে বায়ুর পরিচলন বলে। বায়ুমণ্ডলের উপর স্তরে কম বায়ুচাপ হেতু উত্তপ্ত বায়ু প্রসারিত হয়ে ঠান্ডা হয়। ফলে এতে থাকা জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বিদ্যুৎ বজ্রপাত সহ খুব বৃষ্টি হয়। এই ধরনের বৃষ্টিপাত নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রতিদিন অপরাহ্ণে এবং ক্রান্তি মণ্ডলীয় অঞ্চলে সকালে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

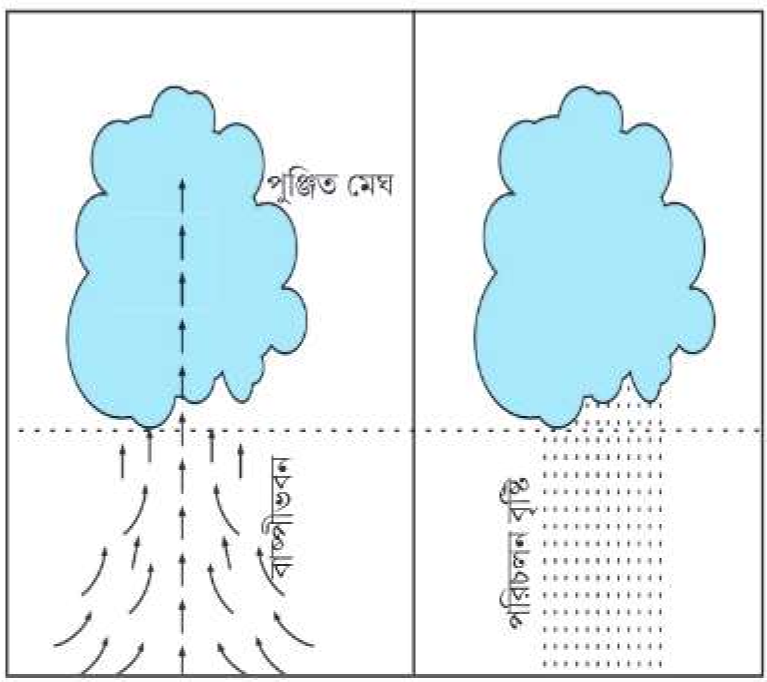

চিত্র - ২.৯ পরিচলন বৃষ্টিপাত

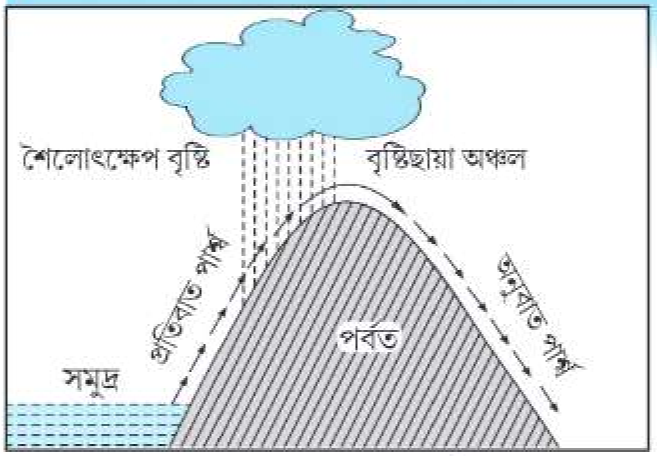

চিত্র : ২.১০ শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত

চিত্র ২.১১ (ক) বাতাবর্ত বৃষ্টিপাত

চিত্র ২.১১ (খ) বাতাবর্ত বৃষ্টিপাত

শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত: জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুর গতিপথে উচ্চভূমি বা পর্বত বাধা দিলে বায়ু উপরে ওঠে ফলে প্রসারিত হয়ে ঠান্ডা হয়। এতে থাকা জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টি হয়। একে শৈলোৎক্ষেপ বা পার্বতীয় বৃষ্টিপাত বলা হয়। পর্বতের যে পাশে বাষ্প বাধা পায় তাকে প্রতিবাত পার্শ্ব বলা হয়। এখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়। অপর পার্শ্বকে অনুবাত পার্শ্ব বলা হয়। অনুবাত পার্শ্বে বায়ু নিম্নগামী হওয়ার কারণে অল্প বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হয়ে থাকে।

প্রদত্ত চিত্রে পশ্চিম পার্শ্ব প্রতিবাত পার্শ্ব এবং পূর্ব পার্শ্ব অনুবাত পার্শ্ব

বাতাবর্ত বৃষ্টিপাত: বাতাবর্তজনিত বৃষ্টিপাতকে বাতাবর্ত বৃষ্টিপাত বলা হয়। বিভিন্ন কারণে ক্রান্তিমণ্ডলের অন্তর্গত সমুদ্রের উপরে বায়ুর চাপ হ্রাস পেয়ে নিম্নচাপ কেন্দ্র সৃষ্টি হয়। এই নিম্নচাপের কেন্দ্রের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়। এই বায়ু ঘুরে ঘুরে উপরে উঠে যায় ও এতে থাকা জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে প্রবল বৃষ্টি করায়।

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে উষ্ণ ও আর্দ্র ক্রান্তীয় বায়ু এবং শীতল ও শুষ্ক মেরু বায়ু মিলিত হয়। শীতল বায়ু ওজনদার। তাই এটা উষ্ণ আর্দ্র বায়ুকে উপরে ঠেলে দেয়। ফলে বাষ্প ধীরে ধীরে উপরে উঠে দীর্ঘ সময় ধরে ঝিরঝিরে বর্ষা করতে থাকে।

তুষারপাত: প্রায়শ অতি উচ্চ পর্বতশ্রেণী কিংবা মালভূমি অঞ্চলে তুষারপাত হয়। এই অঞ্চলে হিমাঙ্ক (০০ সেলসিয়াস) থেকে কম তাপমাত্রায় ঘনীভবন ক্রিয়া হয়। ফলত জলকণাগুলি তুষারকণায় পরিণত হয়ে থাকে। তুষারকণা খুব হালকা ও নরম। সাদা সাদা গুঁড়োর আকারে ভূপৃষ্ঠে পড়ে।

শিলাবৃষ্টি: মেঘ থেকে ভূপৃষ্ঠে পড়া ছোট বড় বরফের টুকরোই শিল পাথর। অতি উত্তপ্ত হয়ে বায়ুর স্রোত সহ জলীয় বাষ্প দ্রুতগতিতে উপরে উঠে মেঘ সৃষ্টি করে। উত্তপ্ত বায়ুর উর্ধ্বগতি হেতু এটা উপরে উঠে যাওয়ায় মেঘে থাকা তুষারকণা ও জলকণা জমাট বেঁধে ছোট বড় পিণ্ডতে পরিণত হয়। এগুলো ভারী। তাই ভূপৃষ্ঠে বৃষ্টি সহ খসে পড়ে। মাঝে মাঝে বড় বড় টুকরোর আকারে শিলাবৃষ্টি হয়। এতে জনজীবনের খুব ক্ষতি হয়। ক্রান্তিমণ্ডলীয় অঞ্চলে প্রায়শ গরমকালে অপরাহ্ণে শিলাবৃষ্টি লক্ষ করা যায়।

বায়ুমণ্ডল প্রকৃতির একটি অতুলনীয় দান। জীবজগতের জন্য এটি একান্ত অপরিহার্য। একে প্রদূষণ মুক্ত রাখার জন্য সর্বস্তরে সচেতনতা সৃষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্নাবলী

১. বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলির নাম লেখো ও তাদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

২. জলবায়ুর নিয়ামকগুলি লেখো। যে কোনও দুটি নিয়ামকের উপরে আলোচনা করো।

৩. পৃথিবীর চাপ বলয়ের চিত্র আঁকো। বিভিন্ন চাপ বলয়ের সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৪. বায়ুপ্রবাহের বিভাগীকরণ করে যে কোনও একটি বিভাগের বর্ণনা করো।

৫. বৃষ্টিপাত কী ? বিভিন্ন প্রকারের বৃষ্টিপাতের সম্বন্ধে আলোচনা করো।

৬. 'ক' স্তম্ভে দেওয়া প্রত্যেক বায়ুকে 'খ' স্তম্ভের সম্পর্কিত স্থানে জুড়ে লেখো।

ক স্তম্ভ	খ স্তম্ভ
চিনুক	পশ্চিমবঙ্গ
লু	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
মেরুবায়ু	রাজস্থান
মৌসুমি	আন্টার্কটিকা
কালবৈশাখী	অ্যান্ডিজ পর্বতমালা
	রকি পর্বতমালা

৭. সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী লেখো:

আয়নোস্ফিয়ার, বাণিজ্য বায়ু, প্রতীপ বাতাবর্ত, সৌরাভিতাপ, কুয়াশা।

৮. ভৌগোলিক কারণ লেখো:

(ক) স্ট্রাটোস্ফিয়ার বিমান চলাচলের জন্য অনুকূল।

(খ) শীতকালে রাত্রে কুয়াশা সৃষ্টি হয়।

(গ) পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার পূর্ব পার্শ্বে কম বৃষ্টি হয়।

(ঘ) নিরক্ষ নিম্নচাপ বলয়কে নিরক্ষ শান্ত বলয় বলা হয়।

(ঙ) পুরী শহরে বেশি গরম বা ঠান্ডা অনুভূত হয় না।

৯. শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) হালকা গ্যাস — স্তরে মজুদ আছে।

(খ) সৌরাভিতাপের পরিমাণ পৃথিবীর — অঞ্চলে সর্বাধিক।

(গ) গতিশীল বায়ুকে — বলা হয়।

(ঘ) গর্জনশীল চালিশা — গোলার্ধে উপলব্ধ।

(ঙ) বৃক্ষলতা আদি — প্রক্রিয়াতে বায়ুমণ্ডলে বাষ্প ছাড়ে।

(চ) তাপমাত্রার দৈনিক হ্রাস বৃদ্ধিকে — বলা হয়।

১০. প্রত্যেকটিকে একটি শব্দে প্রকাশ করো।

(ক) অতি উচ্চ পর্বতশ্রেণীতে হতে থাকা বৃষ্টিপাত।

(খ) বিষুব অঞ্চলে প্রত্যহ অপরাহ্ণে হওয়া বৃষ্টিপাত।

(গ) ঘনীভবনের বিপরীত ক্রিয়া।

(ঘ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে প্রবাহিত সাময়িক বায়ু।

(ঙ) সৌরশক্তি সংগ্রহ ও বিতরণ।

❖❖❖

বারিমণ্ডল

তৃতীয় অধ্যায়

পূর্ব শ্রেণীতে আমরা বারিমণ্ডল সম্বন্ধে পড়েছি। ভূপৃষ্ঠে থাকা মহাসাগর, সাগর, হ্রদ, নদী, হিমবাহ, ভূতল জল এবং বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পকে নিয়ে পৃথিবীর বারিমণ্ডল গঠিত। সমগ্র পৃথিবীর ক্ষেত্রফলের প্রায় ৭১ শতাংশ জলভাগ এবং ২৯ শতাংশ স্থলভাগ। (চিত্রে দেখানো হয়েছে।)

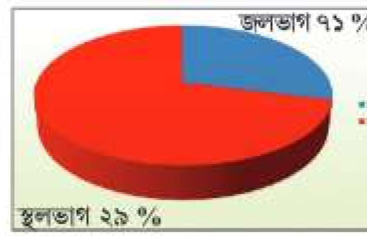

চিত্র ৩.১ ভূপৃষ্ঠে জল ও স্থলভাগের পরিমাণ

পৃথিবীপৃষ্ঠে থাকা সমগ্র জলভাগের প্রায় শতকরা ৯৭.২ ভাগ জল মহাসাগর, সাগর ও হ্রদে রয়েছে। এই জল নোনা। সুতরাং এটা আমাদের ব্যবহারের উপযোগী নয়।

চিত্র ৩.২ মিষ্টি জল ও লবণাক্ত জলের আবণ্টন

পৃথিবীর সমগ্র জলরাশির অবশিষ্টপ্রায় ২.৮ শতাংশ ভাগ জল হচ্ছে মিষ্টি জল। পর্বতের শিখরে থাকা তুষার রাশি নদী, কুয়ো ও পুকুর ইত্যাদি এই প্রকার জলের মুখ্য উৎস। বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ও ভূতল জলও মিষ্টি জলের অন্তর্ভুক্ত।

প্রদত্ত সারণী থেকে আমরা পৃথিবীপৃষ্ঠে লবণাক্ত ও মিষ্টি জলের আবণ্টনের সম্বন্ধে জানতে পারব।

তুমি জানো কি?

১ কিলোগ্রাম জলে যত গ্রাম লবণ দ্রবীভূত থাকে সেটা জলের লবণতাকে সূচিত করে। সাধারণত সমুদ্রজলের লবণতা হচ্ছে এক কিলোগ্রাম প্রতি ৩৫ গ্রাম।

সারণী ৩.১

পৃথিবীপৃষ্ঠে থাকা লবণাক্ত ও মিষ্টি জলের আবণ্টন

	জলের উৎস	জলের শতকরা পরিমাণ	
লবণাক্ত জল	মহাসাগর সাগর	৯৭.২	৯৭.২০৮
	আন্তর্দেশীয় নোনা হ্রদ ও সাগর আদি	০.০০৮	
	হিমটোপর	২.১৫	২.৭৯২
মিষ্টি জল	ভূতল জল ও মৃত্তিকা	০.৬৩২	
	মিষ্টি জলের হ্রদ	০.০০৯	
	বায়ুমণ্ডল	০.০০১	
	নদী	০.০০০১	

সারণী থেকে পৃথিবীতে মিষ্টি জলের পরিমাণ মাত্র শতকরা প্রায় ২.৮ ভাগ বলে জানা যায়। তার মধ্যে আবার হিমটোপ ও ভূতল জলের পরিমাণ শতকরা ২.৭৩ ভাগ। এই জল সহজে মানুষের ব্যবহারে লাগে না। কারণ উচ্চ পর্বত শিখরে ও মেরু অঞ্চলে জমে থাকা বরফ রাশি নিয়ে পৃথিবীর হিমটোপর গঠিত। এটা আমাদের ব্যবহারে লাগতে পারছে না। সেইভাবে ভূতল জলরাশিও সহজে ব্যবহার করা যায় না। নলকূপ ও গভীর নলকূপ (বোরওয়েল) দ্বারা আমরা কিছু অংশে ভূতল জল পেতে পারছি। কিন্তু এটা সব অঞ্চলে উপলব্ধ নয়।

পৃথিবীপৃষ্ঠে জীবজগৎ ও উদ্ভিদ জগতের ব্যবহারের উপযোগী জলের পরিমাণ শতকরা প্রায় ০.০১৫ ভাগ। এটা ভূপৃষ্ঠের সমগ্র জলরাশির অতি নগণ্য অংশ। এটা আবার পৃথিবীর সব অঞ্চলে সমান পরিমাণে পাওয়া যায় না। ঋতুভেদেও ব্যবহার উপযোগী জলের পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

জল বিনা জীবন ধারণ অসম্ভব। তাই 'জলই জীবন' বলা হয়। ব্যবহার উপযোগী জল কম পরিমাণে পাওয়া যায় বলে একে নষ্ট না করে উপযুক্ত বিনিয়োগ করা আবশ্যক। জল সংরক্ষণের জন্য আমাদের সবাইকে উদ্যোগ নিতে হবে।

আমরা ব্যবহার করতে থাকা বিভিন্ন জলের উৎসগুলোর মধ্যে অধিকাংশ গ্রীষ্ম ঋতুতে শুষ্ক হয়ে যায়। পুনর্বার বর্ষা ঋতুতে সেই সব উৎসগুলি জলপূর্ণ হয়ে যায়। ভূপৃষ্ঠ থেকে জল চলে যাওয়া এবং পুনর্বার ফিরে আসা কীভাবে হয় কখনও ভেবে দেপূর্বে পড়েছি, পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ জলরাশি থেকে জল বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলে গিয়ে আকাশে মেঘে পরিণত হয়। বৃষ্টিপাত, করকাপাত ও তুষারপাত দ্বারা এই জল পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়ে বিভিন্ন জল উৎসে মেশে।

চিত্র ৩.৩ জলচক্র

তুমি জানো কি

প্রতি বছর মার্চ মাসের ১২ তারিখ বিশ্ব জল দিবস রূপে পালিত হয়। এদিন বিভিন্ন উপায়ে জল সংরক্ষণ করার জন্য প্রচার ও প্রসার করা হয়।

তোমার জন্য কাজ

তুমি ও তোমার পরিবার পরিবেশে পাওয়া ব্যবহার উপযোগী জলের সংরক্ষণ ও অপচয় না হওয়ার জন্য কী কী পদক্ষেপ নিতে পারবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় জল জলীয় বাষ্পরূপে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। এই জলীয় বাষ্প ঘনীভবন প্রক্রিয়ায় মেঘে পরিণত হয়। পুনর্বার সেটা বর্ষণ দ্বারা ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে। জলের এই চক্রগতিকে জলচক্র বলা হয়।

পৃথিবীর মহাসাগর ও সাগর

পৃথিবীর বারিমণ্ডল প্রধানত মহাসাগর, সাগর, হ্রদ ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। জলভাগ পৃথিবীপৃষ্ঠের শতকরা ৭১ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৩৬ কোটি বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে বিস্তৃত। বারিমণ্ডলের জলরাশির শতকরা প্রায় ৯৭ ভাগ মুখ্যত পৃথিবীর মহাসাগর সাগরের নোনা জলে গঠিত।

পৃথিবীতে চারটি মহাসাগর থাকার কথা আমরা পূর্ব শ্রেণীতে পড়েছি। সেগুলি হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর, অ্যাটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর ও উত্তর মহাসাগর বা সুমেরু মহাসাগর। এই চারটি মহাসাগর ছাড়া কয়েকটি স্থলে দক্ষিণ মহাসাগর বা কুমেরু মহাসাগরকে অন্যতম মহাসাগর রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কুমেরু মহাসাগরটি প্রশান্ত মহাসাগর, অ্যাটলান্টিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের দক্ষিণাংশ নিয়ে গঠিত।

তুমি জানো কি?

ইজরায়েল ও জর্ডন সীমায় অবস্থিত মৃত সাগর (Dead Sea) পৃথিবীর সবথেকে লবণাক্ত হ্রদ। বেশি লবণের জন্য এখানে কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সাঁতারুরা এর উপরে ভাসমান হয়ে থাকে। কারণ অত্যধিক লবণের জন্য জলের ঘনত্ব খুব বেশি হয়।

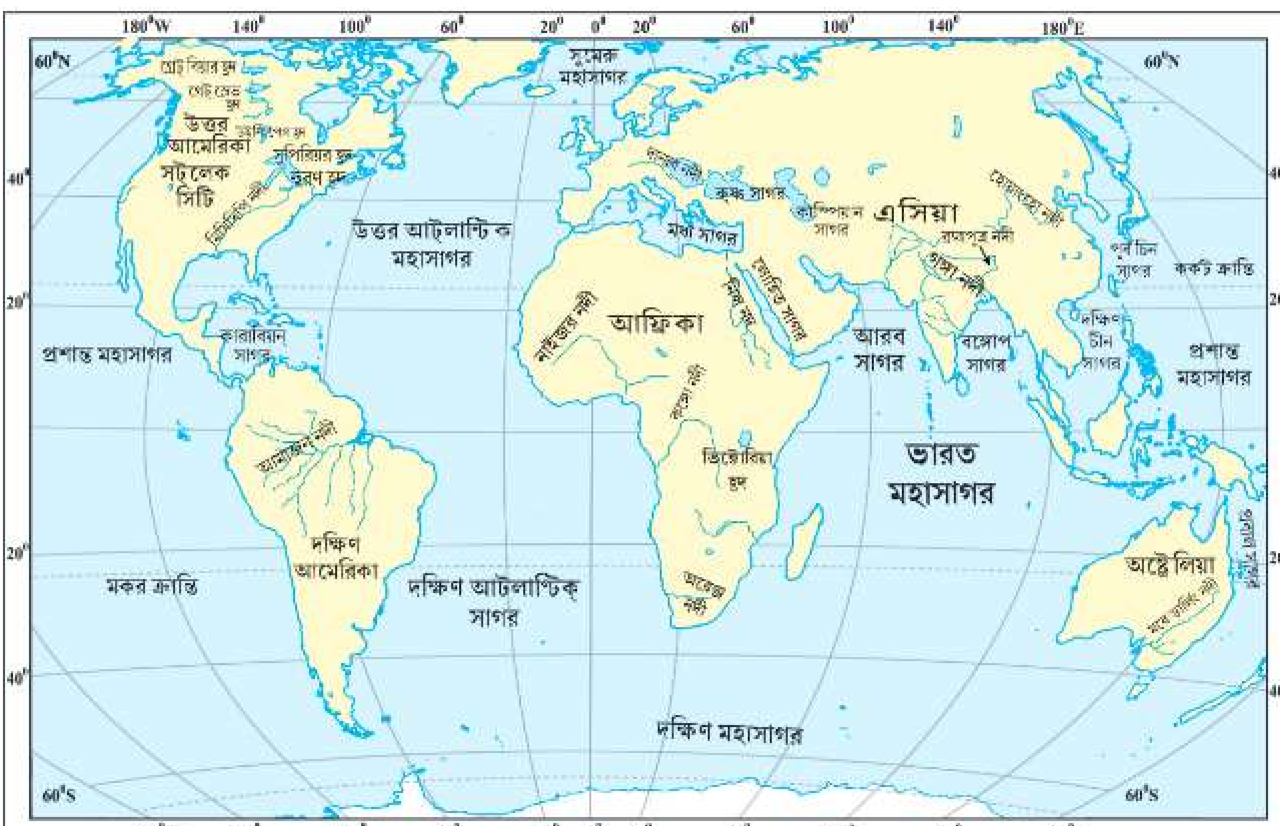

চিত্র ৩.৪: পৃথীবির মূখ্য সাগর, হ্রদ ও নদী

তুমি জানো কি?

মেরীয়ানা খাদের গভীরতা প্রায় ১১,০২২ মিটার বা ১১ কিমির বেশি।

প্রশান্ত মহাসাগর পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মহাসাগর। অন্য সব মহাসাগরের তুলনায় এটি গভীরতম। পৃথিবীর গভীরতম মেরীয়ানা খাদ এই মহাসাগরে অবস্থিত। এই মহাসাগরের পূর্বদিকে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিমদিকে এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া, উত্তরে সুমেরু মহাসাগর ও দক্ষিণে আন্টার্টিকা মহাদেশ অবস্থিত। এর সমগ্র ক্ষেত্রফল পৃথিবীর ক্ষেত্রফলের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। এই মহাসাগরে ফিলিপাইন্স, নিউজিল্যান্ড, জাপান ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি অবস্থিত।

অ্যাটলান্টিক মহাসাগর পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর। এর মোট ক্ষেত্রফল সমগ্র পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রায় এক ষষ্ঠাংশ। এর পূর্বদিকে ইউরোপ ও আফ্রিকা, পশ্চিমদিকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা। উত্তরে সুমেরু মহাসাগর ও দক্ষিণে আন্টার্টিকা মহাদেশ অবস্থিত। এই মহাসাগরে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, গ্রিনল্যান্ড ও আইসল্যান্ড প্রভৃতি দ্বীপ রয়েছে। এই মহাসাগরের উপকূল অধিক দন্তুরিত। ফলে অনেক প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় ও বন্দর গড়ে উঠেছে। এর দুপাশে ইউরোপ আমেরিকার মতো সমৃদ্ধিশালী মহাদেশ থাকায় এখান দিয়ে প্রচুর বাণিজ্য কারবার হয়ে থাকে।

আমাদের দেশের নামে নামাঙ্কিত 'ভারত মহাসাগর' পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মহাসাগর। মানচিত্র দেখে এই মহাসাগরের চারপাশে থাকা মহাদেশের নাম খুঁজে বের করো। ভারত মহাসাগরে শ্রীলঙ্কা, জাঞ্জিবার, মাদাগাস্কার, আন্দামান-নিকোবর এবং লাক্ষাদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপ অবস্থিত। এদের মধ্যে আন্দামান-নিকোবর ও লাক্ষাদ্বীপ আমাদের দেশের অংশবিশেষ।

ক্ষেত্রফলের দৃষ্টিতে উত্তর মহাসাগর পৃথিবীর সবথেকে ছোট মহাসাগর। এটি পৃথিবীর উত্তর মেরু বা সুমেরুকে বেড় দিয়ে আছে বলে একে সুমেরু মহাসাগরও বলা হয়। এর ক্ষেত্রফল ভূপৃষ্ঠের সমগ্র ক্ষেত্রফলের শতকরা প্রায় দু ভাগেরও কম। এই মহাসাগরের দক্ষিণে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া মহাদেশ ও অ্যাটলান্টিক মহাসাগর অবস্থিত। এটি বেরিং প্রণালী দ্বারা প্রশান্ত মহাসাগরের সহিত সংযুক্ত। কানাডা দেশের কয়েকটি দ্বীপপুঞ্জ ও নিউ সাইবেরীয় দ্বীপ এই মহাসাগরে অবস্থিত।

সাগর: ভূপৃষ্ঠে মহাসাগর ব্যতীত অনেকগুলি সাগর ও উপসাগর রয়েছে। এদের জলরাশিও মহাসাগরের মতো লবণাক্ত। এই সাগর ও উপসাগরগুলির মধ্যে অধিকাংশ মহাসাগর বা সাগরের সঙ্গে সংযুক্ত। মহাসাগরদের ক্ষেত্রফল ও গভীরতার তুলনায় সাগরগুলির ক্ষেত্রফল ও

গভীরতা খুব কম। সাগরদের তুলনায় উপসাগরগুলি কম ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট অগভীর এবং স্থলভাগের দ্বারা সীমিত।

পৃথিবীর সাগরগুলোর মধ্যে দক্ষিণ চীন সাগর সবচেয়ে বড়। এটা প্রশান্ত মহাসাগরের অংশবিশেষ। পৃথিবীর অন্যান্য সাগরগুলির মধ্যে জাপান সাগর, পীত সাগর, উত্তর সাগর, ক্যারিবিয়ান সাগর, ভূমধ্য সাগর, আরব সাগর, পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মানচিত্র দেখে সেগুলো কোন্ কোন্ মহাসাগরে অবস্থিত নির্ণয় করো।

পৃথিবীর স্থলভাগের অন্তর্গত কিছু স্থানে নোনা জল থাকা বড় বড় জলভাগ বা হ্রদ দেখা যায়। এদেরকে সাগরের আখ্যাও দেওয়া হয়েছে। কাস্পিয়ান সাগর এরকম একটি আন্তর্দেশীয় হ্রদ।

তোমার জন্য কাজ

পৃথিবীর মানচিত্র দেখে অন্য দুটি আন্তর্দেশীয় হ্রদের নাম লেখো।

মহাসাগর ও সাগরের তলদেশ:

সাগর ও মহাসাগরের জলরাশির নিম্নে থাকা ভূভাগকে সাগর ও মহাসাগরের তলদেশ বলা হয়। ভূমির ওপর যেমন কোথাও সমতলভূমি, নিম্নভূমি, উচ্চভূমি রয়েছে, সেইরকম সমুদ্রের তলাতেও ভিন্ন ভিন্ন ভূমিরূপ আছে। সাগরের তলদেশে কোথাও গভীর খাদ আছে ও কোথাও সমতল অঞ্চল কিংবা উচ্চভূমি বা পাহাড় অথবা পর্বতশ্রেণী রয়েছে।

তুমি জানো কি?

যে স্থলভাগের তিন দিক বিস্তির্ণ জলভাগ বেষ্টিত তাকে উপদ্বীপ এবং যে জলভাগের তিন দিক বিস্তির্ণ স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত তাকে উপসাগর বলা হয়।

সমুদ্রকূল থেকে কিছুদূর পর্যন্ত মহাদেশের অল্প ঢালু ভূভাগ জলের ভেতর ডুবে আছে। একে মহীসোপান বলা হয়। তবে সব অঞ্চলে এর বিস্তৃতি সমান থাকে না। এখানে বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক জীবজন্তু ও উদ্ভিদ দেখা যায়। মহাসাগর ও সাগরের এই অঞ্চলে মাছ ধরার কেন্দ্রগুলি আছে। এই অঞ্চল থেকে খনিজ তৈল, মুক্তা ও পলা সংগ্রহ করা হয়। মহীসোপানের শেষভাগ

চিত্র ৩.৫ মহীসোপান, মহীঢালু, সাগর তল, মহাসাগর খাদ ও নিমজ্জিত শৈলশিলা

থেকে ভূমি অধিক ঢালু হয়ে গভীর সমুদ্রে নেমে গেছে। সমুদ্রের তলায় এই অধিক ঢালু অঞ্চলকে মহীঢালু বলা হয়। মহীঢালু অঞ্চলে অনেক সমুদ্র ঘূর্ণি দেখা যায়। মহীঢালুর নিম্নাংশ থেকে সমুদ্রের তলার বিস্তৃত শয্যাকে মহাসাগর সমতল বলা হয়। এখানে আবার ভূমির ঢাল অতি নগণ্য। তবে মহাসাগর সমতল সম্পূর্ণ সমতল নয়। এখানে মহাসাগর খাদ, নিমজ্জিত পর্বতশ্রেণী প্রভৃতি দেখা যায়। ভূপৃষ্ঠের ক্ষয়প্রাপ্ত অতি সূক্ষ্ম শিলারেণু, আগ্নেয় উৎস ইত্যাদি পদার্থ বহু দূর অব্দি ভেসে গিয়ে সাগর সমতলে জমা হয়। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও জীবজন্তুদের ধ্বংসাবশেষ মহাসাগরের তলায় জমা হয়ে এক ধরনের কোমল পাঁক সৃষ্টি হয়। সেটাকে সিন্ধুমল বলা হয়।

সাগর জলের সঞ্চালন:

সমুদ্রে জলের লবণতার কথা আমরা জানি। সাগর ও মহাসাগরগুলোতে অনেক নদী এসে পড়েছে। তাদের জলপ্রবাহে আনা বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ সাগর ও মহাসাগরের জলে মেশে। সেসব সমুদ্রে সঞ্চিত হয়ে থাকে। ফলে সমুদ্রের জলের লবণতা বেড়ে যায়। সেই রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ও ক্যালসিয়াম সালফেট প্রভৃতি প্রধান। সমুদ্রের জলে সোডিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড লবণের মাত্রা সর্বাধিক। সোডিয়াম ক্লোরাইড আমাদের খাবার নুন। সমুদ্রের জলের লবণতা পৃথিবীর সব অঞ্চলে সমান নয়। সাধারণত ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় উষ্ণমণ্ডল অন্তর্গত সাগর, মহাসাগরের জলে লবণতা অধিক। কারণ এখানে বাষ্পীভবন বেশি। উভয় মেরু অঞ্চলে সমুদ্রের জলের লবণতা কম।

সমুদ্রের জলের তাপমাত্রাও পৃথিবীর সব অঞ্চলে সমান থাকে না। সাধারণত নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে মহাসাগরের জলের তাপমাত্রা ২৫^{0} সেলসিয়াসের থেকে বেশি থাকার সময় মেরু অঞ্চলে এটা প্রায় ০^{0} সেলসিয়াস হয়ে থাকে।

সমুদ্রজলের সঞ্চালন:

ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলের মহাসাগর ও সাগরের জলের তাপমাত্রায় অসমতা, লবণতায় পার্থক্য তথা অসমান বাষ্পীভবন প্রভৃতি কারণে তা চলনশীল হয়ে থাকে। এছাড়া বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রের জলের স্থানান্তর প্রক্রিয়াতে সাহায্য করে থাকে।

সাগর মহাসাগরের জল সর্বদা অস্থির। সমুদ্রজলের এই অস্থিরতা সাধারণত তিন প্রকার। যথা: তরঙ্গ, জোয়ার ও সামুদ্রিক স্রোত।

তরঙ্গ:

সমুদ্রজলের পৃষ্ঠভাগ সমান নয়। এটা ক্রমান্বয়ে উঁচু নিচু হয়ে থাকতে দেখা যায়।

চিত্র ৩.৬. তরঙ্গ

সমুদ্রের জলের পৃষ্ঠভাগ অসমান বা উঁচু নিচু কেন হয়েছে, কখনও ভেবেছ কি? প্রকৃতপক্ষে প্রবাহিত বায়ুর ঘর্ষণের ফলে সাগরপৃষ্ঠের জলে ভাঁজ পড়ে যায়। একে তরঙ্গ বা ঢেউ বলে। সমুদ্রের ঢেউ একটার পরে একটা কূলের দিকে ধেয়ে আসতে দেখা যায়। ধেয়ে আসা প্রতিটি ঢেউ বেলাভূমিতে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায়। সমুদ্রকূলে তরঙ্গের গতি আগুপিছু হওয়ার সময় কূল থেকে কিছু দূরে সমুদ্রবক্ষে এর গতি ঊর্ধ্বে ও নিম্নে হয়। তরঙ্গের উচ্চতম অংশকে তরঙ্গশীর্ষ ও নিম্নতম অংশকে তরঙ্গপাদ বলে। কাছাকাছি অবস্থিত দুটি তরঙ্গশীর্ষ কিংবা তরঙ্গপাদের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলা হয়। তরঙ্গপাদ থেকে শীর্ষ পর্যন্ত উচ্চতাকে তরঙ্গের উচ্চতা বলা হয়।

কখনও কখনও সমুদ্রপৃষ্ঠে হতে থাকা ঝড়ঝঞ্ঝার জন্য বিশালকায় তরঙ্গ সকল সৃষ্টি হয়ে থাকে। সমুদ্রের উপরে বায়ুচাপ কম হয়ে এরকম ঝড়ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে মহাসাগরের নিম্নস্থ ভূভাগের অভ্যন্তরে ভূমিকম্প হয়ে সমুদ্রের জলরাশিতে কম্পনজাত করায়। এর প্রভাবে সমুদ্রের জলে বিশাল তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এইভাবে সৃষ্টি হতে থাকা সমুদ্র তরঙ্গকে জাপানি ভাষায় সুনামি বলে। সাধারণত সুনামি তরঙ্গর উচ্চতা প্রায় ১৫ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই ঢেউ ঘণ্টায় প্রায় ৭০০ কিমি বেগে উপকূলের দিকে ধেয়ে আসে। এর জন্য উপকূলবর্তী অঞ্চলে অকল্পনীয় ক্ষয়ক্ষতি ঘটে থাকে।

তুমি জানো কি?

২০০৪ সালে নভেম্বর মাসের ২৬ তারিখ এক সামুদ্রিক বিপর্যয় (সুনামি) ভারত মহাসাগরে সৃষ্টি হয়ে ভারতের উপকূল অঞ্চলে, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অনেক ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়েছিল। এটা সুমাত্রা দ্বীপের পশ্চিমে সীমায় লেগে এক স্থানে সৃষ্টি হয়েছিল। এই সুনামি ঝড়ের বেগ ঘণ্টায় প্রায় ৮০০ কিমি ছিল। এই সুনামি কূলের দিকে প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে আসার আগে প্রথমে সমুদ্রের জল সমুদ্রের ভেতরে বেশ কিছু দূরে চলে গিয়েছিল। এইরকম আশ্চর্য ঘটনা দেখার জন্য সমুদ্রকূলে প্রচুর লোক জমা হয়েছিল। কিন্তু ঠিক তার পরে পরেই ঢেউ ভয়ংকর বেগে কূলের দিকে ধেয়ে এল। অনেক লোক সমুদ্রের ভেতরে ভেসে গেল। মোটামুটি প্রায় সেই সুনামি-ঝড়ে ১০ হাজারেরও বেশি লোক মারা গিয়েছিল।

চিত্র ৩.৭: সুনামি দ্বারা ঘটে যাওয়া ক্ষয়ক্ষতির দৃশ্য

সমস্ত মহাজাগতিক পিণ্ড (সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি) পরস্পরকে আকর্ষণ করে থাকে। এই আকর্ষণের মাত্রা তাদের বস্তুত্ব (ওজন) ও পরস্পরের থেকে দূরত্বের ওপর নির্ভর করে। সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণের জন্য পৃথিবীর কঠিন ভূভাগ অপেক্ষা জলভাগ অধিক আকর্ষিত হয়ে থাকে। ফলে মহাসাগরের জলস্তর সাময়িকভাবে ফুলে ওঠে। অন্য সময় জলস্তর নেমে যাওয়ার জন্য সমুদ্র পিছিয়ে যাওয়ার মতো লাগে। এইভাবে সমুদ্রে জলপৃষ্ঠে নিয়মিত উত্থান পতন লেগে থাকে। সমুদ্রের এই উত্থানকে জোয়ার ও পতনকে **ভাটা** বলে।

জোয়ার:

সাগর ও মহাসাগরের বক্ষে প্রতিদিন নিয়মিত দুবার করে জোয়ার ও ভাটা হতে থাকে। সূর্য ও চন্দ্র উভয়ে তাদের মহাকর্ষণ শক্তির বলে পৃথিবীর উপরিস্থ প্রত্যেক পদার্থকে আকর্ষণ করতে থাকে। চন্দ্রের তুলনায় সূর্য অনেক বড়। তবে সূর্য পৃথিবী থেকে অনেক দূরে থাকায় চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তি সূর্যের তুলনায় বেশি।অর্থাৎ চন্দ্র পৃথিবীর অতি নিকটে থাকায় এর আকর্ষণ সমুদ্রে জোয়ার সৃষ্টি করাবার প্রধান কারণ হয়ে থাকে। প্রধানত চন্দ্রর আকর্ষণের জন্য সমুদ্রে জোয়ার আসে। সূর্যের আকর্ষণ ও পৃথিবীর গতি এতে সাহায্য করে থাকে। আবর্তনের সময় পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রর সম্মুখীন হয় সেখানে থাকা জলরাশি চন্দ্রের আকর্ষণের

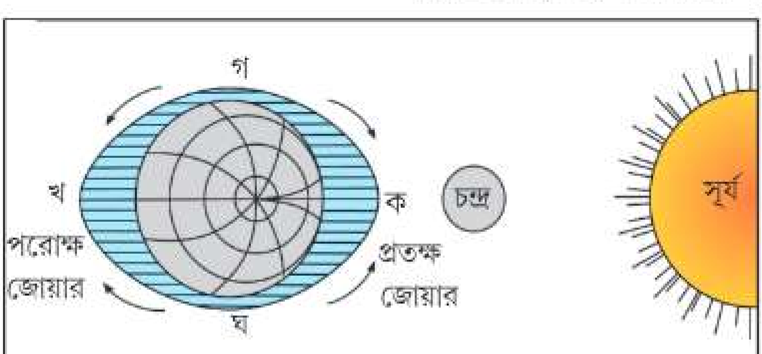

চিত্র ৩.৮. প্রত্যক্ষ জোয়ার ও পরোক্ষ জোয়ার

জন্য ফুলে ওঠে। ফলে জোয়ারের সৃষ্টি হয়। এই জোয়ারকে প্রত্যক্ষ জোয়ার বলা হয়। সেই সময় এর ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত জলরাশির উপরে চন্দ্রের আকর্ষণ প্রায় থাকে না। তবে ভূপৃষ্ঠের কঠিন অংশ কিছু মাত্রায় চন্দ্রের দিকে আকর্ষিত হয়ে থাকে। ফলে জলভাগ ও কঠিন ভূভাগের মধ্যে শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়ে থাকে। একে পূরণ করার জন্য ভূপৃষ্ঠের অন্য অঞ্চল থেকে জলরাশি সেই স্থানে প্রবাহিত হয়ে থাকে। সেই স্থানে সমুদ্রের জল স্ফীত হয়ে জোয়ারের সৃষ্টি হয়। একে পরোক্ষ জোয়ার বলে। সেই সময় পৃথিবীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জোয়ারের মধ্যবর্তী অংশে থাকা সাগর মহাসাগরে জলপৃষ্ঠ হ্রাস পেয়ে ভাটার সৃষ্টি হয়।

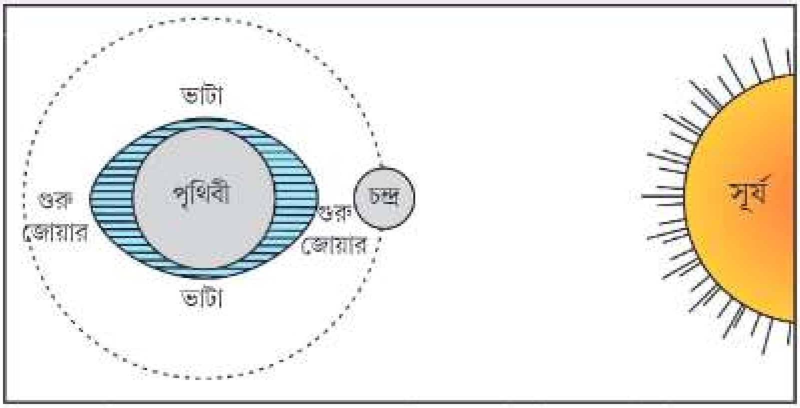

চিত্র ৩.৯. অমাবস্যায় সূর্য, চন্দ্র পৃথিবীর অবস্থিতি।

অমাবস্যা তিথিতে পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য প্রায় এক সরলরেখায় অবস্থান করে। সেদিন চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর এক পাশে অবস্থান করে। উভয়ের আকর্ষণ শক্তি মিলিত ভাবে ভূপৃষ্ঠে পড়ে। ফলে সেদিন অন্য দিনের চেয়ে জোয়ার বেশি হয়ে থাকে। তেমনি পূর্ণিমা তিথিতে সূর্য পৃথিবী ও চন্দ্র এক সরলরেখায় অবস্থান করে। সেদিন সূর্য ও চন্দ্রের মাঝে পৃথিবী অবস্থান করে। উভয় পার্শ্বের আকর্ষণের জন্য উচ্চ জোয়ার হয়। উভয় পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে হতে থাকা উচ্চ জোয়ারকে গুরু জোয়ার বলা হয়। প্রত্যেক মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী ও কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে প্রায় সমকোণে অবস্থান করে। উভয়ের আকর্ষণ পরস্পর

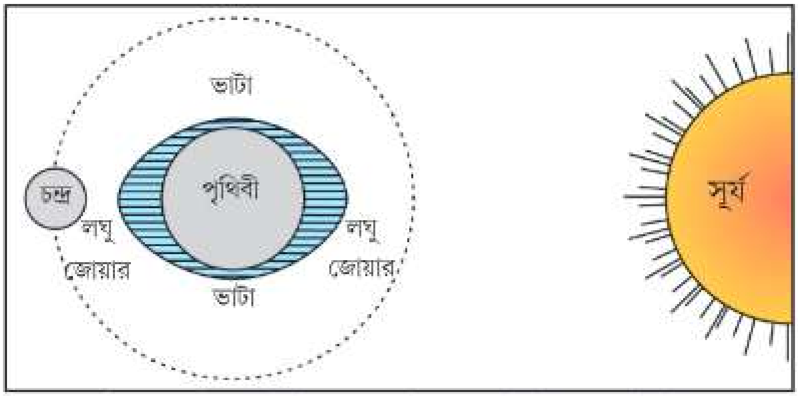

চিত্র ৩.১০. পূর্ণিমাতে সূর্য, চন্দ্র পৃথিবীর অবস্থিতি।

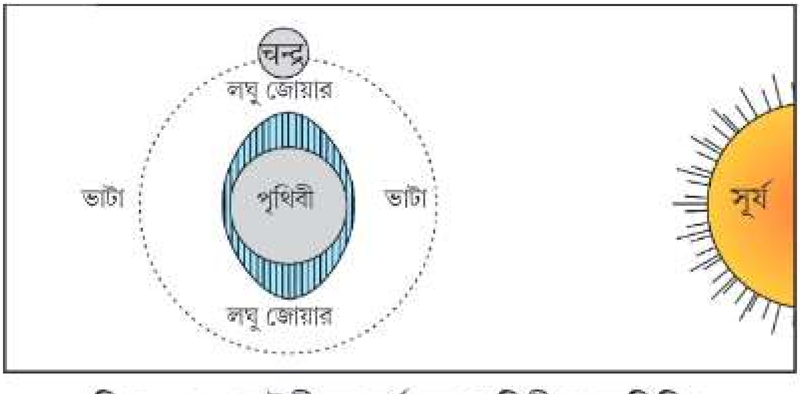

চিত্র ৩.১১. অষ্টমীতে সূর্য, চন্দ্র পৃথিবীর অবস্থিতি।

বিরোধী হয়ে থাকে। জোয়ারের মাত্রা অমাবস্যা কিংবা পূর্ণিমা তিথির মতো বেশি না হয়ে কম হয়ে থাকে। এইরকম জোয়ারকে লঘু জোয়ার বলা হয়।

জোয়ারের জন্য বন্দরগুলোতে জাহাজ চলাচল সুবিধাজনক হয়। এছাড়া মাছ ধরা ও উপকূল অঞ্চলের ময়লা আবর্জনা সাফ করাতে সাহায্যে করে থাকে।

সামুদ্রিক স্রোত:

ভূপৃষ্ঠের বায়ুতে প্রবাহের মতো বিভিন্ন কারণে সমুদ্র জল গতিশীল হয়ে থাকে। সমুদ্রের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে হওয়া এই জলপ্রবাহকে সামুদ্রিক স্রোত বলা হয়।

স্থলভাগে প্রবাহিত নদীর সঙ্গে সামুদ্রিক স্রোতকে তুলনা করা যেতে পারে। সমুদ্রের জল এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে প্রবাহিত হওয়ার কারণ কী? এর অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে সমুদ্র জলের উষ্ণতায় তারতম্য এক প্রধান কারণ। বিষুব অঞ্চলে তথা ক্রান্তি অঞ্চলে বেশি সৌরশক্তি সংগৃহীত হয়ে থাকে। তাই এই অঞ্চল অন্তর্গত সমুদ্র জলের উষ্ণতা অধিক। উষ্ণজল প্রসারিত

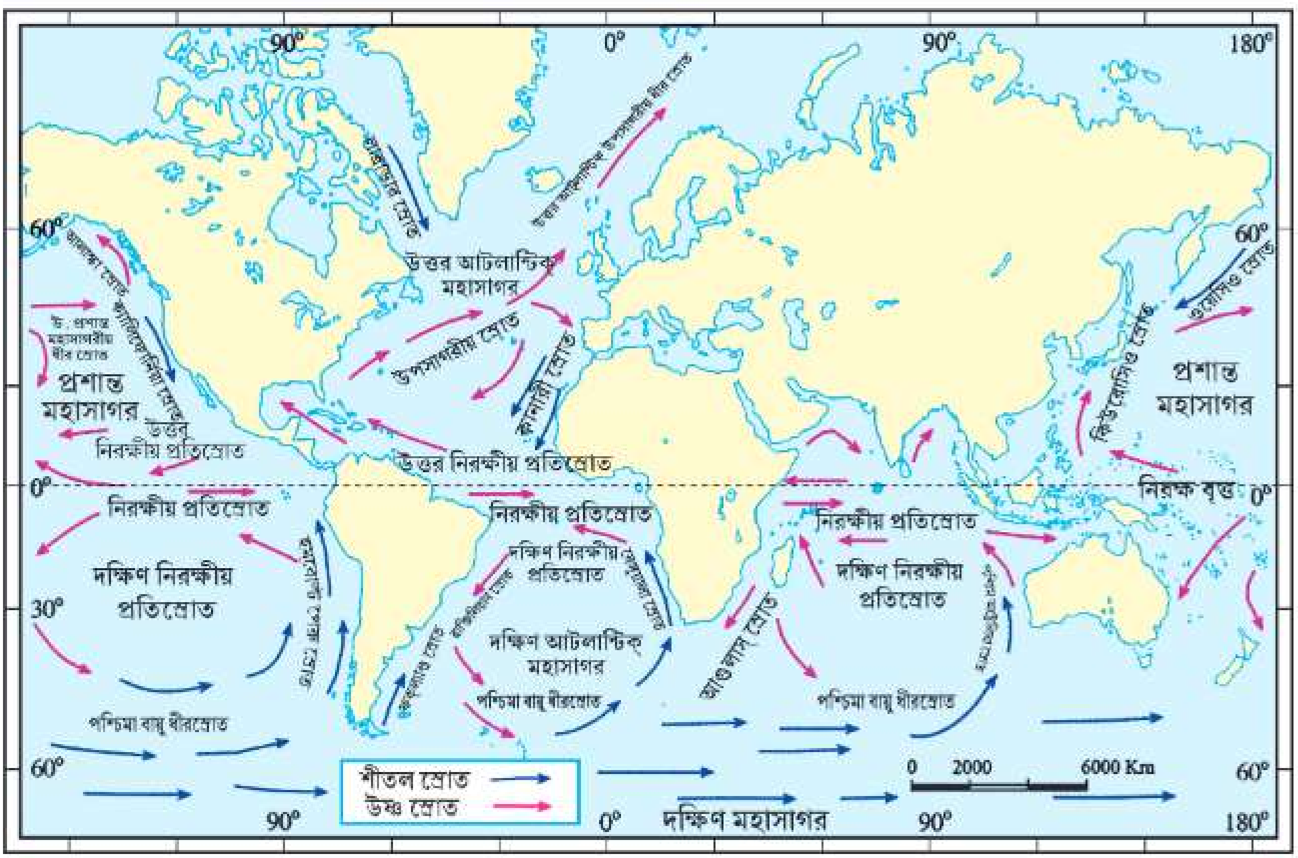

চিত্র. ৩.১২: সামুদ্রিক স্রোত

হওয়ার কারণে এর আয়তন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মেরু অঞ্চলের শীতল জলরাশি সংকুচিত হওয়ায় জলস্তর সামান্য হ্রাস পায়। জলস্তরের সমতা রক্ষা করার জন্য বিষুব তথা ক্রান্তি অঞ্চলের উষ্ণ জলরাশি সমুদ্রপৃষ্ঠে মেরুর দিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। এ ধরনের স্রোতকে উষ্ণস্রোত বলা হয়। উষ্ণজল অপসারিত হওয়া অঞ্চলের জলস্তর পুষিয়ে নেবার জন্য মেরু তথা নিকটবর্তী শীতলজল সমুদ্রের নিম্নভাগে বিষুব অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। এই ধরনের স্রোতকে **শীতল স্রোত** বলা হয়। উষ্ণস্রোত পৃষ্ঠস্রোত ভাবে এবং শীতল স্রোত অন্তঃস্রোত ভাবে প্রবাহিত হয়ে থাকে। উষ্ণতা ব্যতীত সমুদ্র জলে লবণতা ও ঘনত্বর পার্থক্য, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, পৃথিবীর আবর্তন বায়ুপ্রবাহ এবং বায়ুর চাপে পার্থক্য ইত্যাদি সমুদ্রস্রোত সৃষ্টির অন্যান্য কারণ।

আমরা জানি বিষুব অঞ্চল অন্তর্গত মহাসাগরের জলরাশি উষ্ণ স্রোত ভাবে মেরু অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর আবর্তন বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি কারণে এই স্রোত সোজা মেরুর দিকে যেতে পারে না। ক্রান্তি মণ্ডলীয় অঞ্চলে প্রবাহিত পূর্বাবায়ুর (আয়ন বায়ুপ্রবাহ) প্রভাবে এই স্রোত বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বে পশ্চিম দিকে গতি করে। উত্তর গোলার্ধে একে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত এবং দক্ষিণ গোলার্ধে একে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত বলা হয়। উভয় নিরক্ষীয় স্রোত পশ্চিমে প্রবাহিত হওয়ায় মহাসাগরের পশ্চিম পার্শ্বে জলরাশি জমা হয়। ফলে ঠিক বিষুব রেখার নিকট দিয়ে এক পূর্বাভিমুখী নিরক্ষীয় প্রতি স্রোত প্রবাহিত হয়। কোনো স্থল ভাগের দ্বারা বাধা পেলে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত ডানদিকে এবং দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত বাঁদিকে বেঁকে যায়। উভয় স্রোত উপকূল অঞ্চলে প্রায় ৪০০ সমাক্ষরেখা পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে। এখান থেকে পশ্চিমাবায়ু (নিয়ত বায়ু)র প্রভাবে পূর্ব উপকূলের দিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে এবং ক্রমে মেরু অঞ্চলে প্রবেশ করে। সেইরকম মেরু অঞ্চলে সৃষ্ট শীতল স্রোত পূর্বামেরুর বায়ুর প্রভাবে পশ্চিম দিকে গতি করে। পশ্চিমাবায়ুর প্রভাবে এলে এটা পূর্ব দিকে বেঁকে যায়। স্থলভাগে বাধা পেলে এটা উপকূল দিয়ে নিম্ন অক্ষাংশের দিকে গতি করে। ক্রমে এটা নিরক্ষীয় স্রোত উৎপত্তি অঞ্চলে চলে আসে।

মানচিত্র দেখো। মহাসাগরের অবস্থিতি তথা বিস্তৃতি দৃষ্টিতে উপরোক্ত মতে স্রোত প্রবাহ হয়ে থাকে। প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরে এরকম হওয়া লক্ষ করবে।

উষ্ণ সামুদ্রিক স্রোতের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান উপকূলে প্রবাহিত হওয়া জাপান স্রোত বা কিউরোসিও স্রোত উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত প্রধান। আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবাহিত হওয়া উষ্ণ স্রোতের মধ্যে বাহামা স্রোত, উপসাগরীয় স্রোত, উত্তর আটলান্টিক ধীর স্রোত ও ব্রাজিল স্রোত প্রধান। ইউরোপের পশ্চিম উপকূলে প্রবাহিত হওয়া উষ্ণ স্রোত ইউরোপের উষ্ণ কম্বল নামে পরিচিত। এই উষ্ণতার ফলে ইউরোপের পশ্চিম কূলের বন্দরগুলি অধিকাংশ সময় বরফমুক্ত থাকে। ভারত মহাসাগরে প্রবাহিত দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী স্রোত, সোমালি স্রোত, মালাগাসী স্রোত ও মোজাম্বিক স্রোত উষ্ণ সামুদ্রিক স্রোত।

শীতল সামুদ্রিক স্রোতের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবাহিত ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত, কিউরাইল স্রোত, ওপেরু স্রোত ও হামবোল্ট স্রোত প্রধান। আটলান্টিক মহাসাগরে শীতল স্রোতগুলির মধ্যে কানারি স্রোত, লাব্রাডর স্রোত এবং বেঙ্গুয়ালা স্রোত, ফকল্যান্ড স্রোত প্রধান। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া স্রোত ভারত মহাসাগরের অন্তর্গত এক শীতল সামুদ্রিক স্রোত।

তোমার জন্য কাজ:

পাঠ্যে দেওয়া প্রত্যেক মহাসাগরের উষ্ণ ও শীতল স্রোতের অবস্থিতি ও গতিপথ শিক্ষকের সহায়তায় মানচিত্র থেকে বের করে লেখো।

সামুদ্রিক স্রোত প্রবাহিত হতে থাকা মহাসাগর ও সাগরের উপকূলে অবস্থিত অঞ্চলগুলোর জলবায়ু বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। সেই অঞ্চলের বায়ুপ্রবাহ তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাত ইত্যাদি সামুদ্রিক স্রোতের দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। উষ্ণ সামুদ্রিক স্রোত প্রবাহের ফলে সমুদ্র উপরিস্থ বায়ুতে বেশি জলীয়বাষ্প মিশে থাকে এবং এটা বৃষ্টিপাতে সাহায্য করে। সমুদ্র জলের লবণতা এবং উষ্ণতার তারতম্য দূর করতে সামুদ্রিক স্রোত সাহায্য করে থাকে। নদীর মোহনায় সামুদ্রিক স্রোতের প্রবাহের ফলে পলিমাটি সঞ্চিত হয়ে থাকতে পারে না। এটার দ্বারা নদীর মোহনায় ত্রিকোণ ভূমি সৃষ্টি হয় না। শীতল সামুদ্রিক স্রোত ও উষ্ণ স্রোতের মিলন স্থানে প্ল্যাঙ্কটন জাতীয় উদ্ভিদ বহুল পরিমাণে জমা হয়। প্ল্যাঙ্কটন মাছেদের এক প্রকৃষ্ট খাদ্য। যার ফলে সেখানে প্রচুর মাছ দেখা যায়। এই কারণে ইউরোপের ডগর ব্যাঙ্ক ও উত্তর আমেরিকার নিউফাউন্ডল্যান্ড উপকূলে থাকা গ্রান্ড ব্যাঙ্ক প্রসিদ্ধ মাছধরা কেন্দ্র হতে পেরেছে।

প্রবাল স্তূপ:

সমুদ্রে বিরাটকায় তিমি থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এককোষী জীব পর্যন্ত নানা প্রকার জলচর জীবজন্তু বাস করে। প্রবাল কীট শঙ্খ জাতীয় এক ক্ষুদ্র সামুদ্রিক জীব। এগুলি ক্রান্তি মণ্ডলীয় সমুদ্রে প্রায় ২১০ সেলসিয়াস থেকে বেশি তাপমাত্রা থাকা জলে অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। সমুদ্রে ডুবে থাকা পাহাড় পর্বতের ঢালু অঞ্চলে প্রবাল একত্র ভাবে বাস করে। এগুলো মরে যাওয়ার পর সেই স্থানে ঢিপির মতো জমা হয়ে থাকার ফলে তার থেকে প্রবাল স্তূপ সৃষ্টি হয়ে থাকে। পাশাপাশি হয়ে জমা হয়ে থাকা কিছু প্রবালস্তূপ প্রায় পরস্পর সংলগ্ন হয়ে প্রবাল বাঁধ সৃষ্টি হয়ে থাকে। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের পূর্ব উপকূলের অনতি দূরে সমুদ্রে একপ্রকার প্রবাল বাঁধ আছে। এটা 'বৃহৎ প্রবাল বন্ধ' (গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ) নামে পরিচিত। সেই প্রধান বন্ধ বা প্রাচীর খণ্ডিত নয়, অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন। আমাদের দেশ ও প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কার মধ্যে এক ধরনের খণ্ডিত প্রবাল বাঁধ আছে। এছাড়াও কয়েকটি স্থানে বৃত্তাকার খণ্ডিত প্রবাল ঘেরিবন্ধ সৃষ্টি হয়ে থাকে। একে অ্যাটল্ বলা হয়।

চিত্র ৩.১৩. প্রবাল

সাগর ও মহাসাগরীয় সম্পদ:

সাগর ও মহাসাগর অপরিমেয় সম্পদের ভাঁড়ার ঘর। সেইজন্য সমুদ্রকে রত্নাকর বলা হয়। সমুদ্র জল থেকে আমাদের আবশ্যক নুন সংগ্রহ করা হয়। সমুদ্রে অসংখ্য প্রজাতির মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক জীব আছে। সামুদ্রিক মাছ কোটি কোটি লোকের খাদ্যের আবশ্যকতা পূরণ করে থাকে। এছাড়া সমুদ্রে মূল্যবান শঙ্খ, পলা, মুক্তা ইত্যাদি পাওয়া যায়। অলিভ রিডলে কচ্ছপ তথা অন্যান্য সামুদ্রিক জীব নানারকম ঔষধ প্রস্তুতিতে ব্যবহার হয়। সামুদ্রিক জীবেদের সংগ্রহ, তাদের প্রক্রিয়াকরণ ও উপযুক্ত বিনিয়োগ কার্য করে অনেক লোক জীবিকা অর্জন করে থাকে।

মহাসাগর ও সাগরের তলা থেকে আমরা অনেক মূল্যবান সম্পদ পেয়ে থাকি। সেগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমুদ্রগর্ভ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। সমুদ্রতলা থেকে খনন করে খনিজ তৈল আহরণ করা হয়।

প্রশ্নাবলী

১. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির একটি কিংবা দুটি বাক্যে উত্তর দাও।

(ক) পৃথিবীর জলভাগ ও স্থলভাগের ক্ষেত্রে ফল শতকরায় প্রকাশ করলে কত হবে?

(খ) পৃথিবীর মধুর জলের মুখ্য উৎসগুলোর নাম কী?

(গ) জলচক্র কাকে বলে?

(ঘ) বারিমণ্ডল কাকে বলে?

(ঙ) পৃথিবীর মহাসাগরগুলির নাম লেখো।

(চ) মহাসাগরের তল কী?

(ছ) সমুদ্র তরঙ্গ কাকে বলে?

(জ) জোয়ার কী?

(ঝ) সামুদ্রিক স্রোত কাকে বলে?

২. কারণ দেখাও।

(ক) পূর্ণিমা তিথিতে গুরু জোয়ার আসে।

(খ) অষ্টমী তিথিতে লঘু জোয়ার সংগঠিত হয়ে থাকে।

(গ) ডগর ব্যাঙ্ক এক প্রসিদ্ধ মাছ ধরা কেন্দ্র।

(ঘ) পৃথিবীর সামুদ্রিক বাণিজ্যের অধিকাংশ ভাগ অ্যাটলান্টিক মহাসাগর দিয়ে হয়ে থাকে।

৩. সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী লেখো:

(ক) সিন্ধুমল

(খ) মহীঢালু

(গ) সুনামি

(ঘ) পরোক্ষ জোয়ার

(ঙ) ইউরোপের উষ্ণ কম্বল

(চ) প্রবাল বাঁধ

(ছ) অ্যাটল

(জ) প্ল্যাঙ্কটন।

৪. বন্ধনীর মধ্যে থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) পৃথিবীর সাগরগুলির মধ্যে ———— সবচেয়ে বড়।
(লোহিত সাগর, বেরিং সাগর, দক্ষিণ চিন সাগর, ভূমধ্য সাগর)

(খ) পৃথিবীর গভীরতম সামুদ্রিক খাদ ———— মহাসাগরে অবস্থিত।
(প্রশান্ত, আটলান্টিক, ভারত, সুমেরু)

(গ) পৃথিবীতে উপলব্ধ মিষ্টি জলের সর্বাধিক ভাগ ———— তে রয়েছে।
(ভূতল জল, নদী, হিমটোপর, বায়ুমণ্ডল)

(ঘ) জলদিবস ——— তারিখে পালিত হয়।
(সেপ্টেম্বর ২৩, মার্চ ২২, অক্টোবর ২৪, নভেম্বর ১৫)

৫. স্তম্ভ মেলাও।

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
প্রবাল ঘেরিবাঁধ	সবচেয়ে বড় হ্রদ
কাস্পিয়ান সাগর	তীব্র ভূকম্পজনিত তরঙ্গ
জোয়ার	অ্যাটল্
সামুদ্রিক স্রোত	সমুদ্রজলের সাময়িক উত্থানপতন
সুনামি	নির্দিষ্ট গতিপথে প্রবাহিত হওয়া সামুদ্রিক জলরাশি

৬. সমুদ্র জোয়ার ও ভাটা কীভাবে সংঘটিত হয় চিত্রের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও।

৭. সাগর ও মহাসাগরের গুরুত্ব উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

জৈব মণ্ডল

চতুর্থ অধ্যায়

আমরা আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখি সব পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। পরিবেশ ও মানুষের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক আছে। পরিবেশ ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা অসম্ভব। প্রাকৃতিক পরিবেশ জল, স্থল, উদ্ভিদ ও প্রাণীদের নিয়ে গঠিত। তাই অশ্মমণ্ডল, বারিমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল ও জৈবমণ্ডল প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে তিনটি অজৈবিক ও শেষেরটি জৈবিক। তাই প্রাকৃতিক পরিবেশকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। অজৈবিক ও জৈবিক পরিবেশ।

প্রাণী ও উদ্ভিদ নিয়ে জীবজগতের সৃষ্টি। এই জীবজগৎ জৈবমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। জৈবমণ্ডলে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এককোষী প্রাণী অ্যামিবা থেকে বৃহদকায় তিমি পর্যন্ত এবং এককোষী উদ্ভিদ ক্লামাইডোমানাস থেকে রেড উডের মতো বৃহৎ উদ্ভিদ পর্যন্ত রয়েছে। উদ্ভিদরা বাঁচার জন্য ভূ-পৃষ্ঠের মাটির ওপর নির্ভর করে। সমুদ্রের জলেও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ সূর্যালোক পেয়ে বেড়ে থাকে। প্রত্যেক প্রাণী বাঁচার জন্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল। মানুষ তার মৌলিক আবশ্যকতা যথা—খাদ্য, বস্ত্র ও বাসগৃহের জন্য ভূপৃষ্ঠস্থ মৃত্তিকার উপরে প্রকারান্তরে নির্ভর করে থাকে। তাই মৃত্তিকা আমাদের জন্য একটি অমূল্য সম্পদ।

চিত্র: ৪.১: প্রাকৃতিক পরিবেশ।

মৃত্তিকা:

মৃত্তিকা আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি মুখ্য উপাদান। বৃক্ষলতা বাঁচার জন্য মৃত্তিকা জল ও আবশ্যক খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করে থাকে। আমরা জানি, বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে শিলা রেণুতে পরিণত হয়। পরে শিলারেণুর খনিজ অংশের সঙ্গে জৈবিক অংশ মিশে যায়। এটা জল তথা অন্যান্য গ্যাসীয়

পদার্থের প্রভাবে আসার কারণে এতে বিভিন্ন ভৌতিক, জৈবিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। কালক্রমে এটা মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে থাকে। মাত্র এক সেমি ঘন মৃত্তিকা সৃষ্টির জন্য শত শত বছর লেগে যায়।

মৃত্তিকা কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের সমাহার। মৃত্তিকার কঠিন অংশ উভয় শিলারেণু ও জৈবিক পদার্থে গঠিত। প্রাণী ও উদ্ভিদের অপঘটিত ক্ষয়াংশই মৃত্তিকার কঠিন জৈবিক পদার্থ। মৃত্তিকায় থাকা জল এর তরল উপাদান। মাটিতে হতে থাকা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার জন্য এটা অত্যন্ত আবশ্যক। জল ছাড়া শুষ্ক মাটিতে প্রাণদানকারী শক্তি থাকে না। মৃত্তিকার ছিদ্রে অম্লজান, অঙ্গারকাম্ল ও যবক্ষারজান গ্যাস থাকে। বৃক্ষলতা ঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য এই তিনটির মধ্যে ভারসাম্য থাকা জরুরি। মৃত্তিকা ভূপৃষ্ঠে সূক্ষ্ম পাতলা স্তরের মতো আছে।

বৃক্ষলতার জন্য জরুরি পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, বোরন, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, লৌহ ও তামার মতো পোষক উপাদানগুলি, অজৈবিক শিলারেণু থেকে পাওয়া যায়।

তোমার জন্য কাজ:

তোমার অঞ্চলের বিভিন্ন মৃত্তিকার নমুনা সংগ্রহ করো। একে বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগারে জমা করে রাখো।

ভূপৃষ্ঠে বিভিন্ন রঙের মৃত্তিকা দেখা যায়। শিলার ধরন জৈবিক অংশের পরিমাণ ও জলবায়ুর উপরে মৃত্তিকার রং নির্ভর করে থাকে। জৈবাংশ কম থাকলে মাটি সাদা বা হালকা রঙের হয়। জৈবাংশ বেশি থাকলে মৃত্তিকা গাঢ় রঙের হয়। মৃত্তিকায় প্রধানত চার আকারের শিলারেণু থাকে। যথা: কাঁকর, বালি, পলি ও কর্দম। সাধারণত বালি, কদম পলির সুষম মিশ্রণে দো-আঁশলা মাটি সৃষ্টি হয়। মৃত্তিকায় বালির পরিমাণ বেশি থাকলে একে বালিমাটি এবং কাদার পরিমাণ বেশি থাকলে এঁটেল মাটি বলা হয়।

শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে সেই স্থানে মৃত্তিকায় পরিণত হলে তাকে অবশিষ্ট মৃত্তিকা বলা হয়। লালমাটি, কৃষ্ণমাটি, মোরাম মাটি ও জঙ্গল মৃত্তিকা একপ্রকার উদাহরণ। তবে নদী, হিমবাহ বা বায়ুপ্রবাহ দ্বারা অপসৃত শিলারেণু নিম্নভূমিতে জমা হয়। এ থেকে সৃষ্ট মৃত্তিকাকে অপসৃত মৃত্তিকা বলে। পলিমাটি, লোয়েস প্রভৃতি এই ধরনের মৃত্তিকার উদাহরণ।

পরিসংস্থা:

জৈবিক ও অজৈবিক (ভূমিরূপ, জলবায়ু, মৃত্তিকা) উপাদানের মধ্যে থাকা পারস্পরিক সম্বন্ধের জন্য সৃষ্ট পরিবেশকে পরিসংস্থা বলা হয়। গঠন ও কার্য দৃষ্টিতে পরিসংস্থা এক প্রাকৃতিক সংস্থা। পরিসংস্থার প্রত্যেক প্রাণী ও উদ্ভিদ

চিত্র: ৪.২: পরিসংস্থা

পরস্পরের উপরে নির্ভরশীল। এটি ব্যতীত মৃত্তিকা ও জলবায়ুর মতো অজৈবিক উপাদানের উপরে এদের জীবন ও অভিবৃদ্ধি নির্ভর করে। সুতরাং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জৈবিক ও অজৈবিক উপাদানের মধ্যে অন্তঃসম্বন্ধের জন্য অনেক ছোট বড় পরিসংস্থা গড়ে উঠেছে।

জীবালী:

কোনো বিস্তীর্ণ স্থলভাগ ও জলভাগের অন্তর্গত বৃহৎ পরিসংস্থাকে জীবালী বলা হয়। কোনো জীবালীর অন্তর্গত প্রাণী ও উদ্ভিদ অন্য জীবালীর প্রাণী ও উদ্ভিদের থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। বিশেষত স্থলভাগে থাকা স্বতন্ত্র প্রকারে প্রাণী ও উদ্ভিদকে নিয়ে গঠিত বৃহৎ পরিসংস্থাকে জীবালী বলা হয়। জীবালীগুলো সাধারণত উদ্ভিদের বিভিন্নতার ভিত্তিতে বর্গীকৃত হয়ে থাকে।

জলবায়ু ও মৃত্তিকার দৃষ্টিতে মহাদেশীয় পরিসংস্থাকে তিনভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা: ক্রান্তীয়, উপক্রান্তীয় ও মেরু দেশীয়।

উপরোক্ত প্রত্যেক পরিসংস্থায় প্রাকৃতিক উদ্ভিদের অভিবৃদ্ধি মুখ্যত সেখানকার জলবায়ু ও মৃত্তিকা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক উদ্ভিদের ঘনত্ব ও বিস্তার নিয়ে সেখানে খাপ খাইয়ে থাকতে পারা বন্য প্রাণী দেখা যায়।

আকার প্রকারের দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক উদ্ভিদকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা: (ক) অরণ্য (খ) তৃণভূমি (গ) কাঁটাঝোপ।

অধিক তাপমাত্রা ও প্রচুর বৃষ্টিপাত হতে থাকা অঞ্চলে অরণ্য দেখা যায়। মধ্যম বৃষ্টিপাত অঞ্চলে তৃণভূমি এবং অতি কম বৃষ্টিপাত অঞ্চলে কাঁটাঝোপ দেখা যায়।

প্রাকৃতিক উদ্ভিদ ও বন্য প্রাণী:

জলবায়ুর ভিত্তিতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অরণ্য দেখা যায়। সেগুলোর মধ্যে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য, ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় পর্ণমোচী অরণ্য, জোয়ারিয়া অরণ্য ও সরলবর্গীয় অরণ্য প্রভৃতি প্রধান।

ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য: - বিষুব বৃত্তের উভয় পার্শ্বে ১০ ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণ সমাক্ষরেখার অন্তর্গত অঞ্চলে এ ধরনের অরণ্য দেখা যায়। এছাড়া

চিত্র ৪.৩ ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য

ক্রান্তীমণ্ডল অন্তর্গত অধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চলে ও চিরহরিৎ অরণ্য রয়েছে। এই অঞ্চলে সারা বছর বায়ুর তাপমাত্রা বেশি থাকার সঙ্গে বার্ষিক মোটামুটি বৃষ্টিপাত ২০০ সেমির চেয়ে বেশি হয়। এই অরণ্যটি সবুজ হয়ে থাকে। তাই এর নাম চিরহরিৎ (হরিৎ মানে সবুজ) অরণ্য।

চিত্র ৪.৪ (ক) বাঘ

এই অরণ্যে আবলুস, মেহগানী, রোজউড, আইরন উড, ভেনিলা ও রবার জাতীয় বৃক্ষ দেখা যায়। এই অরণ্য খুব ঘন ও বৃক্ষগুলি খুব লম্বা। ভূমিতে সূর্যকিরণ প্রায় পড়েই না। ফলে জমির মাটি সর্বদা স্যাঁতসেঁতে থাকে। এই অরণ্যে বিভিন্ন জাতের পক্ষী, বাঁদর ও সরীসৃপ দেখা যায়। নদী তথা স্যাঁতসেঁতে অঞ্চলে কুমির ও জলহস্তী প্রভৃতি বাস করে।

চিত্র ৪.৪ (খ) হাতি

কঙ্গো ও অ্যামাজন নদীর অববাহিকা, পূর্ব আফ্রিকা ও ইন্দোনেশিয়ায় এ ধরনের অরণ্য দেখা যায়। ভারতের মেঘালয়, তথা সংলগ্নস্থ অঞ্চল এবং পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পশ্চিম পার্শ্বেও এ প্রকার অরণ্য আছে।

চিত্র ৪.৪. (গ) বাঁদর

ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় পর্ণমোচী অরণ্য: উভয় গোলার্ধের প্রায় ৪৫ থেকে ৩৫ ডিগ্রি অক্ষাংশের মধ্যে এ প্রকার অরণ্য দেখা যায়। বাৎসরিক মোটামুটি ১০০-২০০ সেমি বৃষ্টিপাত অঞ্চলে এ প্রকার অরণ্য দৃষ্টিগোচর হয়। তবে এই বৃষ্টিপাত সাধারণত ঋতুভিত্তিক। শুষ্ক ঋতুতে এই অরণ্যের বৃক্ষগুলি পত্র ঝরা দিয়ে থাকে। ভারতে একে মৌসুমি অরণ্যও বলে। চন্দন, সেগুন, শাল, পিয়াশাল, শিশু, অসন, কুরুম প্রভৃতি বৃক্ষ ক্রান্তীয় অরণ্যের প্রধান বৃক্ষ। এই বৃক্ষগুলি গম্বুজাকার, শক্ত ও উচ্চ। এই অরণ্যে বাঘ, সিংহ, ভালুক, হাতি, হরিণ, বরাহ ও বাঁদর প্রভৃতি বন্য প্রাণী থাকে। ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল। উত্তর অস্ট্রেলিয়া ও মধ্য আমেরিকায় এ প্রকার অরণ্য দেখা যায়।

চিত্র ৪.৫. ক্রান্তীয় পর্ণমোচী অরণ্য

উপক্রান্তীয় পর্ণমোচী অরণ্যে ওক্, বিচ্ অ্যাস্ প্রভৃতি বৃক্ষ দেখা যায়। এখানে হরিণ খেঁকশিয়াল নেকড়ে প্রভৃতি প্রাণী ও ফিজান্ট মোনাল আদি পক্ষী থাকে। আমেরিকার উত্তর পূর্বাংশ, চীন, নিউজিল্যান্ড, চিলি ও ইউরোপের পশ্চিম উপকূলে উপক্রান্তীয় পর্ণমোচী অরণ্য দেখা যায়।

চিত্র ৪.৬. উপক্রান্তীয় পর্ণমোচী অরণ্য

জোয়ারিয়া অরণ্য: ক্রান্তি মণ্ডলের অন্তর্গত নদীর মোহনার নিকটবর্তী জোয়ারের জল চেপে আসা স্যাঁতসেঁতে অঞ্চলে এ ধরনের অরণ্য দেখা যায়। উভয় নোনা জল ও মিষ্টি জল বেড়ে ওঠা বৃক্ষ এ অরণ্যে দেখা যায়। সুন্দরী, হেঁতাল, ঝাউ, তাল, নারকেল সুপুরি প্রভৃতি এই অরণ্যের প্রধান বৃক্ষ।

চিত্র ৪.৭. জোয়ারিয়া অরণ্য

সরল বর্গীয় অরণ্য: উত্তর গোলার্ধের ৫০ থেকে ৭০ ডিগ্রি সমাক্ষরেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলে সরল বর্গীয় অরণ্য দেখা যায়। রাশিয়ায় এই ধরনের অরণ্যকে টাইগা বলা হয়।

চিত্র ৪.৮. সরলবর্গীয় অরণ্য

এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে অল্প বৃষ্টি এবং শীতকালে তুষারপাত হয়ে থাকে। এই অরণ্যের বৃক্ষগুলি শঙ্কুর আকৃতির, লম্বা ও নরম কাঠ বিশিষ্ট। এবং পাতা সরু ও নিম্নমুখী হয়ে থাকে। বছরের বিভিন্ন সময়ে পাতা ঝাড়া দেওয়ায় এই অরণ্য চিরহরিৎ থাকে। চির, পাইন, ফার, লার্চ, সিডার প্রভৃতি এই অরণ্যের প্রধান বৃক্ষ। এখানে সাদা শিয়াল, মিঙ্ক সাদা ভল্লুক প্রভৃতি জীবজন্তু দেখা যায়।

তুমি জানো কি?

রুশভাষায় 'টাইগা' শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ অব্যবহৃত।

তৃণভূমি: অবস্থিতির দৃষ্টিতে তৃণভূমি দুপ্রকার। যথা: ক্রান্তীয় তৃণভূমি ও উপক্রান্তীয় তৃণভূমি।

ক্রান্তীয় তৃণভূমি: কর্কট ও মকরক্রান্তীয় মধ্যবর্তী স্বল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চলে ক্রান্তীয় তৃণভূমি দেখা যায়। এখানে পাওয়া বিভিন্ন ঘাসের উচ্চতা ৩-৪ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। খাদ্যের সুলভতার দৃষ্টিতে অনেক তৃণভোজী প্রাণী এখানে দেখা যায়। এদের মধ্যে হাতি জেব্রা, হরিণ, জিরাফ, বুনো মোষ ইত্যাদি প্রধান।

জিরাফ

চিত্র—চিত্র ৪.৯. ক্রান্তীয় তৃণভূমি।

তৃণভোজী প্রাণীদের খেতে থাকা মাংসাশী প্রাণী যথা—বাঘ, সিংহ প্রভৃতি এখানে থাকে। আফ্রিকার সাভানা এক ক্রান্তীয় তৃণভূমি।

উপক্রান্তীয় তৃণভূমি: মধ্য অক্ষাংশের অন্তর্গত মহাদেশের অভ্যন্তরীণ ভাগে স্বল্প বৃষ্টি হওয়া অঞ্চলে এই প্রকার তৃণভূমি দেখা যায়। এই তৃণভূমির

চিত্র ৪.১০: উপক্রান্তীয় তৃণভূমি

ঘাস আকারে ছোট কিন্তু পুষ্টিকর। এখানে গয়ল, বাইসন ও দ্রুত ধাবমান কৃষ্ণসার জাতীয় হরিণ ইত্যাদি প্রাণী দেখা যায়।

কাঁটা ঝোপ:

মরু তথা অর্ধ মরু অঞ্চলে এক প্রকার উদ্ভিদ জন্মায়। অধিক তাপমাত্রা, অতি কম বৃষ্টিপাত, তথা অনুর্বর বেলেমাটির জন্য এখানে ছোট ছোট কাঁটা ঝোপ দেখা যায়। মরুভূমির মরূদ্যানে নাগফেনী, খেজুর, বাবুল ও ফণিমনসার

চিত্র ৪.১১: কাঁটাঝোপ

তুমি জানো কি?

সাভানাকে পৃথিবীর পশুশালা বলা হয়। এটা আবার শিকারিদের স্বর্গ বলেও পরিচিত।

তুমি জানো কি?

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের তৃণভূমির নাম ভিন্ন ভিন্ন

ক্রান্তীয় তৃণভূমি-
পূর্ব আফ্রিকা—সাভানা;
ব্রাজিল—ক্যাম্পোস;
ভেনেজুয়েলা—লিয়ানোস

উপক্রান্তীয় তৃণভূমি:
আর্জেন্টিনা—পম্পাস;
উত্তর আমেরিকা—প্রেরী;
দক্ষিণ আমেরিকা—ভেলড্;
মধ্য এশিয়া—স্টেপ;
অস্ট্রেলিয়া—ডাউনস্।

তুমি জানো কি?

উপক্রান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চলে প্রচুর গম, জব হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে গম জোগানোর জন্য একে পৃথিবীর 'রুটির ঝুড়ি' বলা হয়।

মতো বৃক্ষ দেখা যায়। গাছগুলোর পাতা অতি ছোট ও কয়েক ক্ষেত্রে কাঁটায় রূপান্তরিত হয়ে থাকে। কাণ্ড মাংসল হয়।

তুন্দ্রা বা শীতল মরু উদ্ভিদ:

মেরুর নিকটবর্তী অঞ্চলে বছরের ১০ মাস বেশি ঠান্ডা থাকে। দু-মাস মাত্র গ্রীষ্ম ঋতু। গ্রীষ্মকালে বরফ গললে এই অঞ্চলে মস্ লাইকেন্ জাতীয় শৈবাল গুল্ম জন্মায়। এগুলোকে তুন্দ্রা উদ্ভিদ বলে। এখানে দেখতে পাওয়া

চিত্র ৪.১২: ওয়ালরাস, সাদা ভল্লুক

প্রাণীদের চামড়া মোটা, অধিক লোমশ এবং চামড়ার নীচে বেশি চর্বি জমা হয়ে থাকে। এটা তাদের প্রবল শীত থেকে রক্ষা করে। সিল, তিমি, ওয়ালরাস, বলগা হরিণ, মেরু ভল্লুক, মেরু শিয়াল ও মেরু পেঁচা প্রভৃতি প্রাণী এখানে দেখা যায়।

উচ্চ পার্বত্য ভূমির পাদদেশ থেকে উপরের দিকে ক্রমান্বয়ে চিরহরিৎ অরণ্য, পর্ণমোচী অরণ্য, সরলবর্গীয় অরণ্য ও তুন্দ্রা উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায়।

আর্থিক অভিবৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের আবশ্যকতা বৃদ্ধি পেতে লেগেছে। শিল্পায়ন, শহরীকরণ, জল জাহাজ, রেলের কোচ, রেলরাস্তা নির্মাণ, বিভিন্ন গৃহ আসবাবপত্র তথা জ্বালানির জন্য ব্যাপক জঙ্গল ক্ষয় হচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী বিলুপ্ত হতে চলেছে। আমাদের মনে রাখা উচিত যে উদ্ভিদ, পশুপক্ষী আমাদের পরিবেশের মুখ্য অঙ্গ। তাদের উপরে মানব জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল।

পরিবেশে উদ্ভিদ পশুপক্ষী ও মানব সমাজের মধ্যে ভারসাম্য থাকা নিতান্ত জরুরি। এই ভারসাম্য নষ্ট হলে মানব সমাজ টিকে থাকা কষ্টকর হবে। সুতরাং আমরা নতুন জঙ্গল সৃষ্টি করা সহ প্রাকৃতিক জঙ্গলের ক্ষয় রুখতে যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

তুমি জানো কি?

উট দীর্ঘদিন জল পান না করে বেঁচে থাকতে পারে। এবং বালির ওপর দিয়ে সহজে যাওয়া আসা করতে পারে। তাই একে 'মরুভূমির জাহাজ' বলে।

তুমি জানো কি?

উচ্চ পার্বত্যভূমিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অরণ্য দেখা যায় কেন উত্তর বুঝে লেখো।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য:

কোনো পরিসংস্থার অন্তর্গত জৈব ও অজৈব উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া লেগে থাকে বলে পূর্বে পড়েছি। উদ্ভিদ ও প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য জল, বায়ু ও মৃত্তিকা আদি অজৈবিক উপাদান আবশ্যক করে থাকে। ভূমি বা মৃত্তিকা প্রাণী ও উদ্ভিদদের বাসস্থান, খাদ্য, মৌলিক উপাদান ও শক্তি জোগায়। কিছু প্রাণী ও উদ্ভিদ জলে ও বায়ুতে থাকে ও বংশবৃদ্ধি করে। প্রাণীরা জলকে পানীয় ভাবে ব্যবহার করে। বৃক্ষলতা অদি মাটি থেকে খনিজ লবণ ও জলশোষণ করে খাদ্য প্রস্তুত করে থাকে। কিছু ব্যাকটেরিয়া যবক্ষারজানকে মাটিতে মেশাতে সাহায্য করে। বৃক্ষলতাদি খাদ্য প্রস্তুতের সময় বায়ুমণ্ডলে অম্লজান ছাড়ে। উদ্ভিদ মাটি থেকে সংগৃহীত জলকে বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলে ছাড়ে। বৃক্ষলতাদির শিকড় মাটিকে বেঁধে রাখায় মৃত্তিকাক্ষয় হ্রাস পায়। এই ভাবে পরিসংস্থার অন্তর্গত জৈব ও অজৈব উপাদানের মধ্যে অনবরত পদার্থ ও শক্তির আদানপ্রদান চলতে থাকে।

খাদ্যশৃঙ্খল:

উদ্ভিদ প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে আলো, জল, অন্যান্য লবণাদি সংগ্রহ করে নিজের খাদ্য প্রস্তুত করে থাকে। তাই উদ্ভিদকে উৎপাদক বলা হয়।

প্রাণীরা নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করতে পারে না। সমস্ত প্রাণী খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে থাকে। কিছু প্রাণী খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদজগতের উপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ—ছাগল, ভেড়া, মোষ, গরু, হরিণ, খরগোশ প্রভৃতি প্রাণী ঘাস বা গাছের পাতা খায়। এদেরকে তৃণভোজী প্রাণী বলা হয়।

তবে বাঘ সিংহের মতো মাংসাশী প্রাণীরা তৃণভোজী প্রাণীদের খেয়ে বেঁচে থাকে। এছাড়া অন্যান্য বহু ছোট ছোট প্রাণীদের খেয়ে অপেক্ষাকৃত বড় বড় প্রাণীরা বেঁচে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন পোকামাকড়কে ব্যাঙ খায়। ব্যাঙকে ছোট সাপ, ছোট সাপকে বড় সাপ, সাপকে বেজি খেয়ে বেঁচে থাকে। প্রাণীরা মরে যাওয়ার পরে তাদেরকে ব্যাকটেরিয়া অপঘটন করে মাটিতে মেশায়। এ থেকে আমরা জানলাম যে পরিসংস্থার অন্তর্গত প্রত্যেক জীব খাদ্য ও শক্তির জন্য অন্য জীবের উপর নির্ভর করে থাকে। একে খাদ্যশৃঙ্খল বলে। সুতরাং প্রত্যেক শ্রেণীভুক্ত জীব খাদ্যশৃঙ্খলের কড়ির মতো কাজ করে। পরে অন্য উদাহরণের মাধ্যমে এটা দেখানো হয়েছে।

তোমার জন্য কাজ:

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে উদ্ভিদ প্রত্যেক খাদ্যশৃঙ্খলের প্রথম কড়ি এবং ব্যাকটেরিয়া শেষ কড়ি—এর কারণ কী?

তোমার জন্য কাজ:

তুমি অন্য কয়েকটি খাদ্যশৃঙ্খল প্রস্তুত করো।

চিত্র: ৪.১৩: খাদ্যশৃঙ্খল প্রক্রিয়া

খাদ্যজালক:

যে কোনো পরিসংস্থায় অনেক খাদ্যশৃঙ্খল থাকে। একটি খাদ্যশৃঙ্খলের কড়ি হওয়া প্রাণী অন্য এক খাদ্যশৃঙ্খলের কড়িও হতে পারে। এইভাবে জড়াজড়ি হয়ে থাকা খাদ্যশৃঙ্খলগুলিকে খাদ্যজালক বলা হয়। নিম্নে প্রদত্ত উদাহরণ থেকে জানতে পারবে।

চিত্র: ৪.১৪: খাদ্য জালক

শক্তিপ্রবাহ ও শক্তিস্তর: পূর্ব আলোচনা থেকে জানলাম যে উদ্ভিদ জগৎ উৎপাদক এবং প্রাণীরা ভক্ষক শ্রেণীভুক্ত। উদ্ভিদ মাটি থেকে সংগৃহীত খনিজ লবণ সৌরশক্তি দ্বারা রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে সঞ্চয় করে থাকে। তৃণভোজী প্রাণীরা গাছের বিভিন্ন অংশ খেয়ে বাঁচে ও বাড়ে। ফলে উদ্ভিদে থাকা রাসায়নিক শক্তি তৃণভোজী প্রাণীরা গ্রহণ করে। তৃণভোজী প্রাণী থেকে এই শক্তি মাংসাশী প্রাণী এবং মানুষের কাছে যায়। পরিসংস্থায় এইরকম শক্তির স্থানান্তরকে শক্তি প্রবাহ বলে। শক্তিপ্রবাহের প্রথম স্তরের উৎপাদক বা উদ্ভিদ দ্বিতীয় স্তরে তৃণভোজী প্রাণী। তৃতীয় স্তরে মাংসাশী প্রাণী ও চতুর্থ স্তরে দ্বিতীয় স্তর মাংসাশী প্রাণী থাকে। প্রথম স্তর থেকে চতুর্থ স্তরের দিকে নির্দিষ্ট দিকেই শক্তি প্রবাহ হয়ে থাকে। তবে শক্তি প্রবাহের পরিমাণ প্রথম স্তর থেকে চতুর্থ স্তরের দিকে ক্রমশ কমে যায়।

প্রথম স্তরে উদ্ভিদ বহু পরিমাণে থাকায় এতে শক্তির পরিমাণ বেশি থাকে। উদ্ভিদভোজী প্রাণী এই শক্তির কিছু অংশ গ্রহণ করে থাকে। মাংসাশী প্রাণীর সংখ্যা কম থাকায় এরা গ্রহণ করতে থাকা শক্তির পরিমাণ কমে যায়। একে চিত্রে প্রকাশ করলে এটা একটা পিরামিডের মতো দেখায়। একে শক্তি পিরামিডবলা হয়।

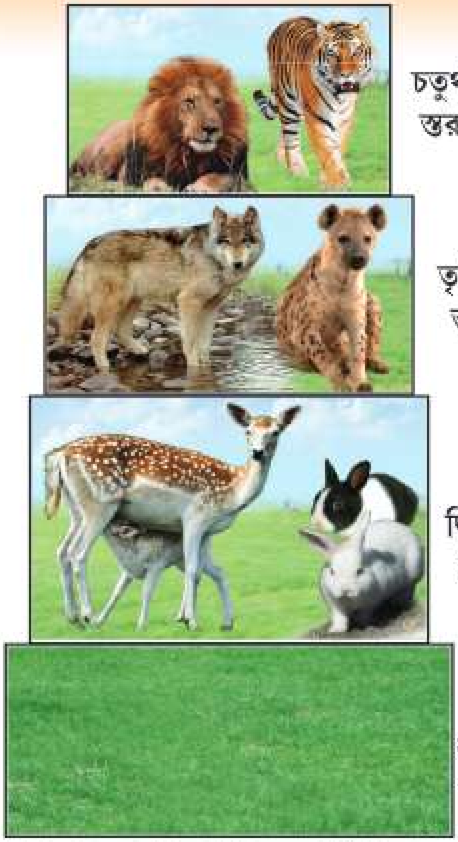

চিত্র ৪.১৫ शक्ति की प्रवाह को लेकर एक पिरामिड

জৈব ভারসাম্য:

খাদ্য খাদক সম্পর্কের দৃষ্টিতে শক্তি পিরামিডের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ভারসাম্য থাকা নিতান্ত আবশ্যক। অর্থাৎ প্রথম স্তর থেকে চতুর্থ স্তরের দিকে জীবের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া জরুরি। প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে সংখ্যাগত সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হয়। এ ধরনের সংখ্যাগত সুসম্পর্ককে জৈব ভারসাম্য বলা হয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণ তথা মানব কার্যকলাপের জন্য জৈব ভারসাম্য লোপ পেতে চলেছে। অত্যধিক জঙ্গল ক্ষয় করার জন্য বিভিন্ন শক্তিস্তরের মধ্যে সংখ্যাগত সুসম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে। অনেক প্রজাতির বৃক্ষলতা ও প্রাণী নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। নিম্ন স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হলে চতুর্থ স্তরে থাকা মানুষ নিশ্চিতভাবে বিপদগ্রস্ত হবে। সুতরাং জৈব ভারসাম্য রক্ষার দিকে আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত।

প্রদূষণ ও পরিবেশ অবক্ষয়:

মানুষ বাঁচার জন্যে বিভিন্ন প্রকার কার্য করে থাকে। গ্রামাঞ্চলে কৃষি ও শহরাঞ্চলে শিল্প ও বাণিজ্য লোকেদের মুখ্য অর্থনীতিক কার্য। এই সব কার্য থেকে বর্জ্যবস্তু সৃষ্টি হয়। এসব জল বায়ু ও মাটিতে মিশে যায়। ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশের এই দূষিত ও সংক্রমিত অবস্থাকে প্রদূষণ বলে। প্রদূষণ করতে থাকা বর্জ্যবস্তুকে প্রদূষক বলে। আমাদের পরিবেশের অন্তর্গত বায়ু, জল, ও মৃত্তিকা কীভাবে প্রদূষিত হচ্ছে, এসো আলোচনা করব।

বায়ু প্রদূষণ:

উভয় প্রাকৃতিক ও মনুষ্যকৃত কারণে বায়ু দূষিত হয়ে থাকে। প্রধানত অগ্নি উদ্গিরণের সময় শয়ে শয়ে টন পরিমাণে আগ্নেয় ভস্ম ও গ্যাস বায়ুতে প্রবেশ করে। ফলে বায়ু দূষিত হয়। জোরে হাওয়া দেওয়ার ফলে, ধুলো, ধোঁয়া, বিষাক্ত বাষ্প ইত্যাদি বায়ুতে মেশে ও বায়ুকে দূষিত করে।

চিত্র ১৪.১৬: বায়ুপ্রদূষণ

বায়ু প্রদূষণে মনুষ্যকৃত কারণ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন কলকারখানা, মোটরগাড়ি, উড়োজাহাজ আণবিক বিস্ফোরণ, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদি থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া, ধুলো, ছাই ইত্যাদি বায়ু প্রদূষণের মুখ্য কারণ। এছাড়া বিভিন্ন খনিজ ও জৈবিক জ্বালানির ব্যবহারে বায়ু প্রদূষিত হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে শস্য উৎপাদনের সময় কাঠ, বাঁশ ঘুঁটে ইত্যাদি জ্বলার জন্যে বায়ু প্রদূষণ হয়ে থাকে। বড় বড় শহরাঞ্চলে অধিক যানবাহন চলাচল, কলকারখানা ও ঘন জনবসতি এর প্রধান কারণ। গাড়ি, মোটর থেকে নির্গত ধোঁয়া ভূপৃষ্ঠের নিকটে হওয়ার কারণে মানুষের স্বাস্থ্য বিপজ্জনক হচ্ছে। প্রদূষিত বায়ুকে প্রশ্বাস গ্রহণ করার জন্য আমরা বিভিন্ন প্রকার রোগের শিকার হচ্ছি। শ্বাসনালী ও ফুসফুস সংক্রামিত হবার কারণে অনেক লোক অকালে মৃত্যুবরণ করছে। এছাড়া নানা প্রকার চর্ম রোগ, যক্ষ্মা ও স্নায়বিক রোগ প্রভৃতি বায়ুদূষণের কারণ।

তোমার জন্য কাজ

তোমাদের অঞ্চলে বায়ুপ্রদূষণ কীভাবে হচ্ছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

তুমি জানো কি ?

আমাদের রাজধানী দিল্লির পঞ্জীকৃত সব গাড়িকে একটা সারিতে রাখলে সেটা নীলনদ ও আমাজন নদী দুটির দৈর্ঘ্য সমষ্টির সঙ্গে প্রায় সমান হবে।

তোমার জন্য কাজ

তুমি তোমার ঘরের পরিবেশের প্রদূষণ রোখার জন্য কী করতে পারবে ?

চিত্র ১৪.১৭: বায়ুপ্রদূষণ

বায়ু দূষণের জন্য বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হতে লেগেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু ও আবহাওয়াতে অনিয়ম দেখা দিচ্ছে। কিছু স্থানে অল্পবৃষ্টি হচ্ছে। এর কুপ্রভাব মানুষ জীবজগৎ ও উদ্ভিদের ওপর পড়ছে।

বায়ু প্রদূষণকে যথাসম্ভব রোখার জন্যে সচেতন অবশ্যই হওয়া দরকার। এর জন্যে অবশ্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়েছে। দিল্লির মতো কিছু শহরে মোটর গাড়িতে সি. এন. জি (কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস) ব্যবহার করা হচ্ছে।

রান্নার জন্য গ্যাস ব্যবহারকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া বৃক্ষরোপণ তথা সামাজিক বনীকরণের মাধ্যমে বাষ্পদূষণ রুখতে উদ্যম নেওয়া হচ্ছে।

জল প্রদূষণ:

জলের অপর নাম জীবন। জল বিনা জীবজগৎ টিকে থাকা সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ তথা প্রাণীদের ব্যবহারের জন্য জল প্রদূষিত হতে লেগেছে। বড় বড় শহরের নর্দমার জল, আবর্জনা, কলকারখানা থেকে বেরোতে থাকা ময়লা জলে মেশার জন্য জল প্রদূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধ জলে মেশার ফলে জল প্রদূষিত হচ্ছে। সেই রকম ভূক্ষয় দ্বারা জীবজন্তুদের পচা গলা শব ও উদ্ভিদের পাতা ইত্যাদি পচে গিয়ে জল প্রদূষিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ঘরোয়া কাজের দ্বারাও জল প্রদূষিত হয়ে থাকে।

চিত্র ৪.১৮ জল প্রদূষণ

প্রাণীরা জলকে পানীয়ভাবে ব্যবহার করে। দূষিত জল ব্যবহার করার ফলে জলচর প্রাণীরা বিভিন্ন রোগের শিকার হওয়ার সঙ্গে মৃত্যুমুখে পড়ে থাকে। এই দূষিত জল পান করার ফলে মানুষরা বিভিন্ন অন্ত্রনালী রোগ যথা—কলেরা, ন্যাবা ইত্যাদি রোগের শিকার হচ্ছে। আমাদের দেশে দূষিত জল পান করে প্রতি বছর হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে থাকে। গঙ্গা, যমুনা থেকে মহানদী পর্যন্ত সব বড় বড় নদীর জল এখন ব্যবহার উপযোগী নয়। নদীর জল সমুদ্রে মেশায় সমুদ্রের জলও প্রদূষিত হচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণীর জীবনহানি ঘটছে।

আমাদের শরীর সুস্থ রাখার জন্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক। সাধারণত কুয়ো, পুকুরের জল ব্লিচিং পাউডার ও ক্লোরিন বড়ি দিয়ে জল শুদ্ধ করে পান করা বা ব্যবহার দরকার। এছাড়া জল ফুটিয়ে পরিষ্কার কাপড়ে ছেঁকে বা ফিল্টার যন্ত্রে ছেঁকে জল পান করলে আমরা বিভিন্ন সংক্রমিত রোগের হাত থেকে রক্ষা পাব। জলের অত্যধিক ব্যবহার ও জল প্রদূষণ রুখতে আমাদের সবার সহযোগিতা আবশ্যক। ঘরের ময়লা জল যেমন কাপড় কাচা, ধোয়া, স্নান করা জল বাগানে পুনর্ব্যবহার করা উচিত।

তোমার জন্য কাজ

জল প্রদূষণের অন্যান্য কারণগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

তুমি জানো কি?

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও কলকারখানার গরম জল নদীতে মিশে নদীর জলের তাপমাত্রা বাড়ায় ফলে জলচর জীব ও উদ্ভিদের ওপর এর প্রতিকূল প্রভাব পড়ে।

তুমি জানো কি?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের সর্বক্ষণ থেকে জানা যায় যে ভারতে প্রায় এক চতুর্থাংশ সংক্রামক রোগ দূষিত জলের জন্য হয়ে থাকে। পৃথিবীর শতকরা ২৫ ভাগ লোক বিশুদ্ধ পানীয় জল পায় না।

তোমার জন্য কাজ

বড় প্লাস্টিকের বোতল কেটে দু টুকরো করো। দুটোতেই বালি কাঁকর কাঠকয়লার স্তর দিয়ে ফিল্টার যন্ত্র তৈরি করো।

মৃত্তিকা প্রদূষণ:

জল ও বায়ুর মতো মৃত্তিকা প্রদূষণ এক প্রধান সমস্যা। মৃত্তিকাক্ষয়, মাটিতে জলীয় অংশ কমে যাওয়া, ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য মাটিতে মেশা তথা বিভিন্ন বর্জ্যবস্তু মাটিতে মেশার জন্য মৃত্তিকা প্রদূষণ হয়। রাসায়নিক সার ও

চিত্র ৪.১৯. মৃত্তিকা প্রদূষণ

বিষাক্ত কীটনাশক দ্রব্যের ব্যবহারের জন্য মৃত্তিকাকে হালকা করতে থাকা কেঁচো প্রভৃতি জীব মরে যায়। ফলে মৃত্তিকার জলবায়ু ধরে রাখার ক্ষমতা কমে যায় ও উর্বরতা হ্রাস পায়। কলকারখানা বর্জ্য বস্তু, ছাই প্রভৃতি ভূমিকে প্রদূষিত করে। বড় বড় শহরাঞ্চলে প্রতিদিন হাজার হাজার টনের কঠিন বর্জ্য বস্তু বেরোয়। এটা রাস্তাঘাট, সর্বসাধারণ স্থান ও নালা নর্দমায় জমে থাকে। এগুলো পচে গিয়ে দুর্গন্ধ বেরোয় এবং বিভিন্ন রোগের কারণ হয়। প্লাস্টিক দ্রব্য ও পলিব্যাগ প্রচুর ব্যবহারের জন্য মৃত্তিকা প্রদূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রদূষিত মৃত্তিকা ভেদ করে যাওয়া জলও ভূতল জলকে প্রদূষিত করে।

তোমার জন্য

মৃত্তিকা প্রদূষণের জন্য লোকে কী ধরনের অসুবিধের সম্মুখীন হচ্ছে তার একটি তালিকা করো।

তুমি জানো কি?

ডেসিবেল—শব্দের তীব্রতা মাপার একক। সাধারণ কথাবার্তার শব্দ ২০-৩০ ডেসিবেল, চেঁচিয়ে কথাবার্তার শব্দ ৫০-৬০ ডেসিবেল। মোটরসাইকেল চালাবার শব্দ ১০৫ ডেসিবেল।

শব্দ প্রদূষণ:

আজকাল শব্দ প্রদূষণ খুব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাস, ট্রেন, যানবাহন প্রভৃতি চলাচল, কলকারখানা, রেডিও, টিভি, মাইক, বিবাহ ও দীপাবলিতে আতসবাজির জন্য শব্দ প্রদূষণ হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলের শব্দ প্রদূষণের মাত্রা অধিক। প্রচণ্ড বাজের শব্দে কেউ কেউ কানে কালা হয়ে যায়।

তোমার জন্য কাজ

তোমার অঞ্চলে কীভাবে শব্দ প্রদূষণ হচ্ছে, তার তালিকা প্রস্তুত করো।

আমাদের কান এক নির্দিষ্ট তীব্রতার শব্দ গ্রহণ করতে পারে। সর্বাধিক ৭০ ডেসিবেল শব্দে মানুষের কানে কিছু ক্ষতি হয় না (সর্বদা নয়)।

শহরাঞ্চলে অত্যধিক যানবাহন তথা কলকারখানা থেকে নির্গত উচ্চ শব্দের জন্য মানুষের শ্রবণ শক্তির উপরে কুপ্রভাব পড়ছে। লোকদের মধ্যে প্রধানত মাথা ব্যথা, মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিবেশ দূষণের জন্য মুখ্যত মানুষই দায়ী বলে জানলাম। সুতরাং আমাদের পরিবেশের উপযুক্ত যত্ন নেওয়া দরকার। উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের স্থিতিকে রক্ষা করা নিতান্ত জরুরি। এসো পরিবেশকে প্রদূষণ মুক্ত করার সঙ্গে এর সংরক্ষণ করব। কারণ পরিবেশ বাঁচলেই আমরা বাঁচব। এর জন্য নিম্নে প্রদত্ত পদক্ষেপগুলি নেওয়া উচিত।

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণ।

২. জল, খনিজ লবণ ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।

৩. জঙ্গল ক্ষয় হ্রাস ও নূতন জঙ্গল সৃষ্টি।

৪. বন্য জন্তু শিকার নিয়ন্ত্রণ ও লুপ্তপ্রায় জীবদের জন্য অভয়ারণ্য জাতীয় উদ্যান সৃষ্টি।

৫. কলকারখানা থেকে বেরোনো আবর্জনার পুনঃচক্রন।

৬. জীবজন্তুদের মল থেকে ও অন্যান্য আবর্জনা থেকে বায়োগ্যাস ও জৈবিক সার প্রস্তুত তথা অন্যান্য বিনিয়োগ।

৭. হানিকারক সার ও কীটনাশকের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার। জৈব সার ও জৈব কীটনাশক বহুল পরিমাণে ব্যবহারের উপরে গুরুত্ব।

৮. যানবাহন চলাচলের জন্য বিদ্যুৎ শক্তি ও সি. এন. জি ব্যবহার করা।

৯. কলকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়াকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিশোধিত করে বায়ুমণ্ডলে অঙ্গারকাম্ল গ্যাস বৃদ্ধি রোখা।

১০. শব্দ প্রদূষণ রোখার জন্য সচেতনা সৃষ্টি করা।

উপরিলিখিত পদক্ষেপ ব্যতীত আমাদের দৈনন্দিন জীবন পরিবেশ প্রদূষণ হ্রাস করার জন্য আরও অনেক পদক্ষেপ নেবার আবশ্যকতা আছে। এর জন্য শিক্ষা ও প্রচারের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি নিতান্ত আবশ্যক। তুমি পরিবেশের সুরক্ষার জন্য কী কী পদক্ষেপ নিতে পারবে? চিন্তা করো এবং শ্রেণীতে আলোচনা করো।

প্রশ্নাবলী

১. **নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলি লেখো:**

(ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ　(খ) জৈবমণ্ডল

(গ) পরিসংস্থা　(ঘ) জীবালী

(ঙ) খাদ্যশৃঙ্খল　(চ) খাদ্যজালক

(ছ) মৃত্তিকা

২. **পার্থক্য দেখাও:**

(ক) ক্রান্তীয় তৃণভূমি ও নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি

(খ) দোআঁশলা মাটি ও কাদামাটি

(গ) অবশিষ্ট মৃত্তিকা ও অপসৃত মৃত্তিকা

(ঘ) তৃণভোজী প্রাণী ও মাংসাশী প্রাণী

(ঙ) উৎপাদক ও ভক্ষক।

৩. **স্তম্ভ দুটির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে লেখো।**

	‘ক’ স্তম্ভ	‘খ’ স্তম্ভ
১.	ক্রান্তীয় চিরহরিৎ	শাল
২.	ক্রান্তীয় পর্ণমোচী	মনসা
৩.	জোয়ারিয়া	সিডার
৪.	সরলবর্গীয়	মেহগনি
৫.	কাঁটা ঝোপ	লাইকেন
		সুন্দরী

৪. **কারণ দর্শাও**

(ক) মেরু অঞ্চলের প্রাণীদের চামড়া অধিক লোমযুক্ত।

(খ) সরলবর্গীয় অরণ্যে শঙ্কু আকারের বৃক্ষ দেখা যায়।

(গ) উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়।

৫. খাদ্য ও খাদক সম্পর্ক ক্রমানুসারে লেখো।

(ক) বোয়াল মাছ, পত্র, ব্যাকটিরিয়া, ছোট মাছ, কেঁচো।

(খ) সর্বভুক, প্রাথমিক ভক্ষক, উৎপাদক, দ্বিতীয় ভক্ষক।

(গ) ঘাস, বাঘ, হরিণ, ব্যাকটেরিয়া।

৬. বন্ধনীর মধ্যে থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) আর্জেন্টিনার তৃণভূমিকে___________ বলা হয়।

(ডাউমস, পম্পাস, প্রেরী, স্টেপ)

(খ) পৃথিবীর পশুশালা -___________ তৃণভূমি।

(ক্যাম্পোস, সাভানা, লিয়ানোস, স্টেপ)

(গ) ___________ ক্রান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চলের প্রাণী।

(বাইসন, ওয়ালরাস, গয়ল, জিরাফ)

(ঘ) পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি ___________ তৃণভূমি।

(সাভানা, লিয়ানোস, পম্পাস, ক্যাম্পোস)

(ঙ) সাধারণ কথাবার্তার শব্দ___________ ডেসিবেল

(২৫, ৫৫, ১০০, ১০৫)

৭. সংক্ষেপে উত্তর লেখো:

(ক) খাদ্যশৃঙ্খল কী, উদাহরণ সহ বোঝাও।

(খ) জৈব ভারসাম্য বলতে কী বোঝায়?

(গ) কী কী কারণের দ্বারা জল দূষিত হয়?

(ঘ) শক্তিপ্রবাহ কী?

(ঙ) জল, বায়ু ও মৃত্তিকার প্রদূষণ রোখার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে?

৮. বাক্সর মধ্যে কয়েকটি প্রাণী ও উদ্ভিদ লুকিয়ে আছে। খুঁজে বের করো।

দে	বা	ই	স	ন	ক	বি	জ
ব	র	ওয়া	ল	রা	স	চ্	ল
দা	খ	চে	আ	না	কো	ন্তা	পা
রু	লা	ষ্ঠ	ন্টি	চ	শা	ল	ই
সি	ভা	ন	লো	জে	ব্রা	ফা	র্
ঙ্ক	লু	ঠ্	প	কা	ক	ট	স
সি	ডা	র	ট	ও	ক	সি	ল
অ	লি	ভ	ঘ	ক	শি	য়া	ল

৯. পৃথিবীর রেখাঙ্কিত মানচিত্র এঁকে তৃণভূমিগুলি দর্শাও।

ব্যাবহারিক ভূগোল

পঞ্চম অধ্যায়

ভূগোল লব্ধ জ্ঞানকে মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপে প্রয়োগ করার পদ্ধতিকে ব্যাবহারিক ভূগোল বলা হয়। ভূগোল শাস্ত্র একটি ক্ষেত্র বিজ্ঞান। এতে বিভিন্ন স্থান বা অঞ্চল সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ বা অধ্যয়নের আবশ্যকতা থাকে। ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহের জন্যে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বা পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীর আকার অনেক বড় হওয়ায় এর ক্ষুদ্র প্রতিরূপ গ্লোব বা ভূগোলক ও মানচিত্র ব্যবহারকে ভূগোল শিক্ষায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। পূর্ব শ্রেণীতে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের নিত্যদিনের জীবনকে আবহাওয়া ওজনবায়ু বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বাষ্প তাপমাত্রা, চাপ ও আর্দ্রতা, পবনের বেগ ও দিক, বৃষ্টিপাত ও আকাশের অবস্থা থেকে আবহাওয়া ও জলবায়ুর সম্বন্ধে জানা যায়। ।

বলতে পারবে কি?

আমাদের শরীরের তাপমাত্রা সাধারণত কোন্ এককে প্রকাশ করা হয়?

তাপমাত্রা নিরূপণ:

তাপমান যন্ত্রদ্বারা বায়ুর তাপমাত্রা নির্ণয় করা হয়। ডিগ্রি এককে তাপমাত্রা প্রকাশ করা হয়। যে ডিগ্রি তাপমাত্রায় জল বাষ্পে পরিণত হয় তাকে **স্ফুটনাঙ্ক** এবং যে ডিগ্রি তাপমাত্রায় জল বরফে পরিণত হয় তাকে **হিমাঙ্ক** বলে।

সাধারণত তিন প্রকার একক দ্বারা তাপমাত্রা মাপা হয়।

১) সেলসিয়াস

২) ফারেনহাইট

৩) রিউমার।

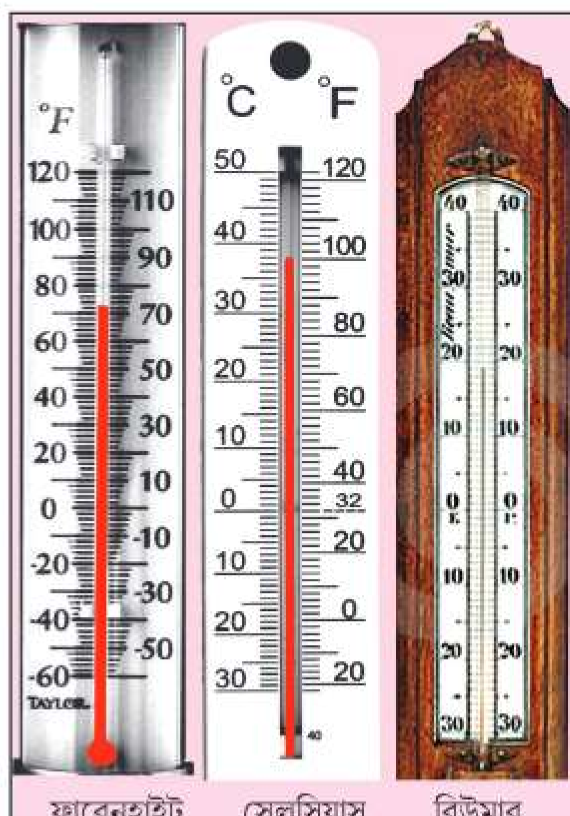

চিত্র ৫.১. (ক) বিভিন্ন একক বিশিষ্ট তাপমাত্রা যন্ত্র।

বলতে পারবে কি?

প্রদত্ত চিত্র থেকে অন্য দুটি একক হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক জানতে চেষ্টা করো।

আমাদের দেশে একক বিশিষ্ট তাপমাত্রা যন্ত্র প্রায়ত সেলসিয়াস তাপমান যন্ত্র ব্যবহার হয়। এই তাপমান যন্ত্রে হিমাঙ্ক ০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও স্ফুটনাঙ্ক ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বায়ুর তাপমাত্রা নিরূপণের জন্য সাধারণ তাপমান যন্ত্র ব্যতীত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যন্ত্র ও ব্যবহার করা হয়। এটা ইংরাজী 'U' অক্ষরের আকারের এক স্বতন্ত্র তাপমাত্রা যন্ত্র। এতে ব্যবহৃত কাচের নলের বাঁ পাশে বাহু সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ও ডান পাশের বাহু সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দেখায়। দিন রাত্রি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এর থেকে সহজে জানা যায়। আজকাল জল হাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে ক্রমাগতভাবে তাপমাত্রা রেকর্ড করার জন্য থার্মোগ্রাফ নামক যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে।

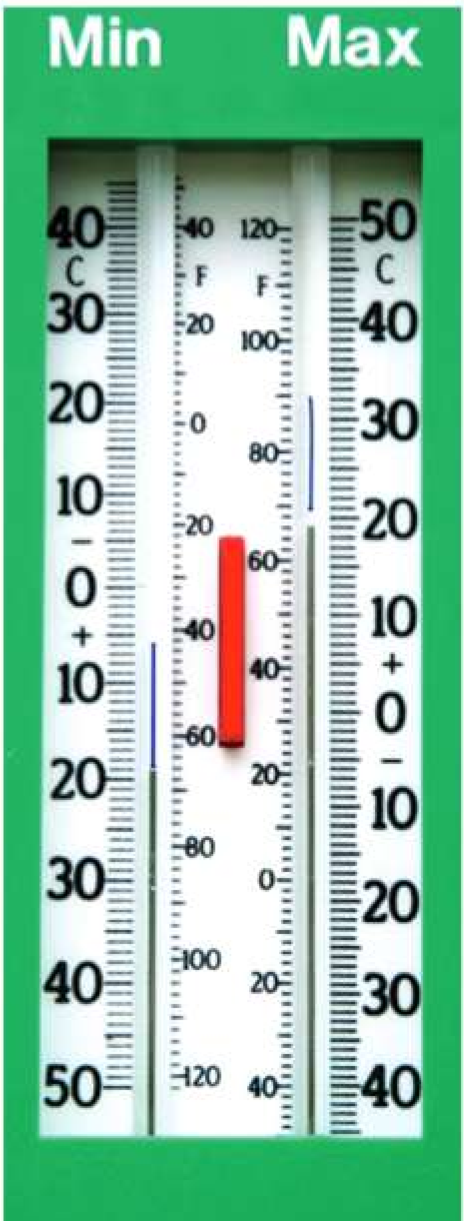

চিত্র ৫.১: (খ) সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমান যন্ত্র।

চিত্র চিত্র ৫.১ (গ) থার্মোগ্রাফ

বায়ুর চাপ: ব্যারোমিটার বা চাপমান যন্ত্র দ্বারা বায়ুর চাপ নির্ণয় করা হয়। চাপমান যন্ত্র সাধারণত দুপ্রকার (১) পারদ চাপমান যন্ত্র, (২) অ্যানিরয়েড চাপমান যন্ত্র।

পারদ চাপমান যন্ত্রের অন্তর্গত কাচের নলে পারদ স্তম্ভের উচ্চতা বায়ুর চাপের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে। এই পারদ স্তম্ভ সাধারণত সমুদ্রপৃষ্ঠে ৭৬ সেমি. উচ্চতা পর্যন্ত হয়ে থাকে। বায়ুর চাপ হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে পারদ স্তম্ভের উচ্চতারও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। এই চাপমান যন্ত্র ত্রুটিশূন্যভাবে বায়ুর চাপ নিরূপণ করে থাকে। কিন্তু এর আকার বিরাট হওয়ায় একে আনা-নেওয়া করা খুব অসুবিধাজনক।

অ্যানিরয়েড চাপমান যন্ত্রে একটি ধাতব বাক্সের সঙ্গে স্প্রিং দ্বারা একটি কাঁটা এর উপরে থাকা গোলাকর ড্রামের উপর লেগে থাকে। ধাতব বাক্স থেকে বায়ু বের করে নিয়ে ভেতরটা শূন্য রাখা হয়। ফলে বায়ুর চাপ বাড়লে এটা সংকুচিত হয় এবং বায়ুর চাপ কমে গেলে এটা ফুলে ওঠে। বাক্সের সঙ্গে লেগে থাকা কাঁটাটি এই পরিবর্তনকে এর উপরিস্থ বায়ুর চাপ সূচিত করা গোলাকার ড্রামের উপরে দেখায়। এটি ছোট এবং আনা-নেওয়া করা সহজ। তাই এর ব্যবহার বিশেষভাবে দেখা যায়। তবে বায়ুর চাপ মাপতে এতে সঠিকতা থাকে না।

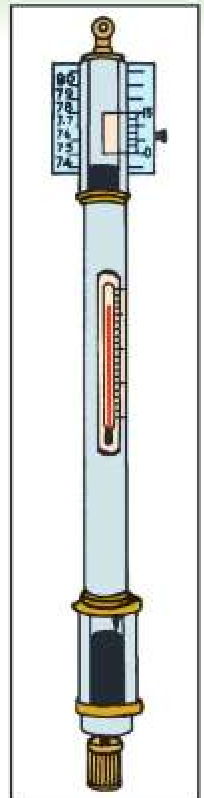

চিত্র ৫.২. (ক) পারদ চাপমান যন্ত্র

চিত্র ৫.২. (খ) অ্যানিরয়েড চাপমান যন্ত্র

পবন দিক চিহ্ন যন্ত্র বা উইন্ডভেন:

পবন কোন্ দিক থেকে বইছে জানার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রে একটি লম্বা দণ্ডের উপরে হালকা মোরগের ছবি কিংবা হালকা তিরচিহ্ন দেওয়া থাকে। পবন বইলে মোরগের মুখ বা তিরের মুখ হাওয়ার দিকে থাকে। চিহ্নর তলায় পূর্ব (পূ), পশ্চিম (প), উত্তর (উ) ও দক্ষিণ (দ) দিক চিহ্ন পরস্পরের সঙ্গে সমকোণে দণ্ডের সঙ্গে আটকানো থাকে। এতে বায়ু কোন্ দিক থেকে বইছে, সহজে বোঝা যায়।।

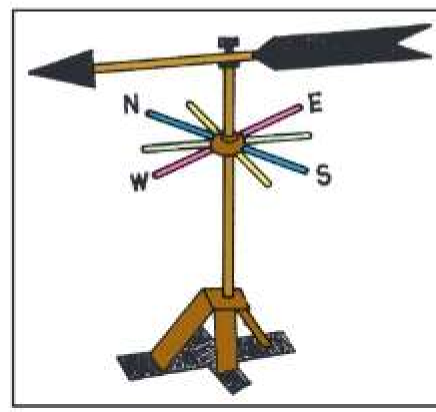

চিত্র ৫.৩. উইন্ডভেন

পবন বেগমাপক যন্ত্র বা অ্যানিমোমিটার:

অ্যানিমোমিটার যন্ত্রে পবনের বেগ মাপা হয়। এতে তিনটি বা চারটি অর্ধগোলাকার ধাতব কাপ লাগানো থাকে। এগুলো লম্বভাবে একটি লৌহদণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকে। কাপগুলোর ভেতরে হাওয়া ঢুকলে কাপগুলো ঘুরতে থাকে। পবনের বেগ বাড়লে কাপগুলো জোরে ঘুরতে থাকে। লম্ব লৌহদণ্ডের মূলে থাকা ঘড়ির মতো একটি মাপক যন্ত্রের সঙ্গে কাপগুলো তারের দ্বারা সংযুক্ত হয়ে থাকে। এর থেকে পবনের বেগ বোঝা যায়। কয়েকটি ক্ষেত্রে উভয় দিক চিহ্ন যন্ত্র ও বেগমাপক যন্ত্র একই সাথে লাগানো থাকে।

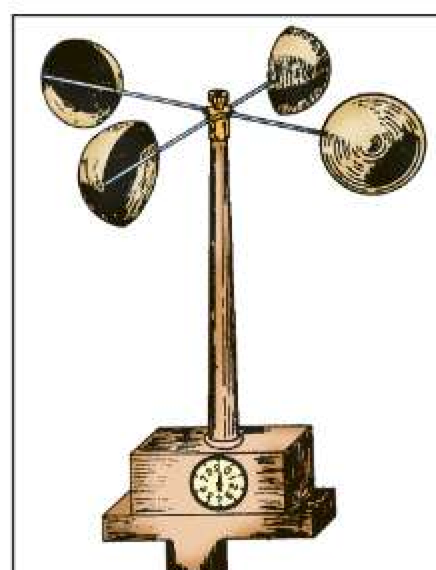

চিত্র ৫.৪. অ্যানিমোমিটার

আপেক্ষিক আর্দ্রতা:

হাইগ্রোমিটার নামক যন্ত্র দ্বারা বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা মাপা হয়। বিভিন্ন প্রকার হাইগ্রোমিটারের মধ্যে আর্দ্র ও শুষ্ক বাল্ব হাইগ্রোমিটার অধিকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর্দ্র ও শুষ্ক বাল্ব হাইগ্রোমিটারে দুটি তাপমান যন্ত্র পাশাপাশি থাকে। একটার বাল্বকে সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত কাপড়ে জড়িয়ে

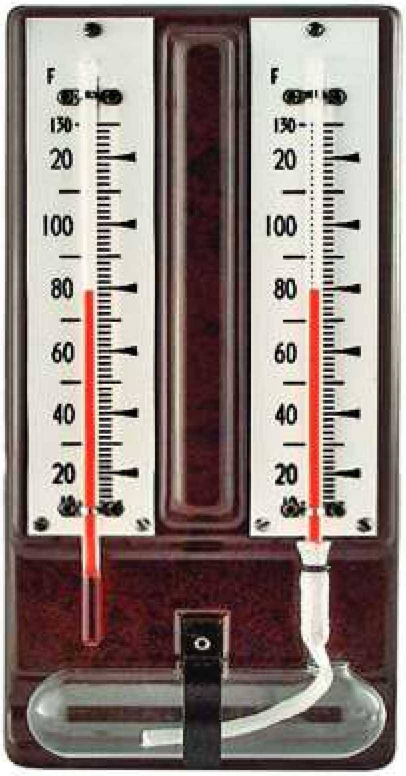

চিত্র - ৫.৫ : হাইগ্রোমিটার

জলপাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়। অন্য তাপমান যন্ত্রটি সাধারণ বায়ুর তাপমাত্রা নির্ণয় করে। আর্দ্র বাল্ব তাপমান যন্ত্রের ভিজে কাপড় থেকে জল বাষ্পীভূত হওয়ার কারণে বাল্বটি ঠান্ডা থাকে ও কম তাপমাত্রা রেকর্ড করে। বায়ুর শুষ্কতার উপরে বাষ্পীভবন নির্ভর করায় আর্দ্র বাল্বের তাপমাত্রা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়।

উভয় তাপমান যন্ত্রর তাপমাত্রায় থাকা পার্থক্যকে হিসেব করে এক নির্ধারিত সারণীর (এই যন্ত্রসহ প্রদত্ত) সাহায্যে আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয় করা হয়।

বৃষ্টিমাপক যন্ত্র:

বৃষ্টির পরিমাণ বৃষ্টিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে মাপা হয়। এই যন্ত্রটি ১২.৫ সেমি. থেকে ২০ সেমি. ব্যাস বিশিষ্ট এক তামার সিলিন্ডার। এর ভিতরে সেই সমান

তুমি জান কি?

রাসায়নিক হাইগ্রোমিটার ও বৈদ্যুতিক হাইগ্রোমিটার দ্বারাও আপেক্ষিক আর্দ্রতা মাপা হয়।

তুমি জান কি?

আপেক্ষিক আর্দ্রতা-বায়ু নির্দিষ্ট পরিমাণে জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে পারে তবে বায়ুতে প্রকৃতপক্ষে জলীয় বাষ্প কম বেশি থাকতে পারে। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বায়ুতে থাকা জলীয় বাষ্পের পরিমাণ তথা সেই তাপমাত্রায় বায়ুর জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতার অনুপাতকে শতাংশে প্রকাশ করাকে বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলা হয়।

তুমি জান কি?

রাসায়নিক হাইগ্রোমিটার ও বৈদ্যুতিক হাইগ্রোমিটার দ্বারাও আপেক্ষিক আর্দ্রতা মাপা হয়।

চিত্র ৫.৬ - বৃষ্টিমাপক যন্ত্র

ব্যাস বিশিষ্ট তামার চোঙ নিম্নভাগে কাচের জার বা তামার পাত্রে প্রবেশ করে থাকে। চোঙের নিম্ন ভাগের ছিদ্র খুব ছোট হয়। সমগ্র তামার সিলিন্ডারকে আর এতটা টিনের খোল দ্বারা আবৃত করে রাখা হয়। বৃষ্টিমাপক যন্ত্রের নিম্নাংশ মাটির নীচে এবং উপরের অংশটি মাটির উপর প্রায় ৩০ সেমি উঁচুতে থাকে। সাধারণত খোলা মাঠে বৃষ্টিমাপক যন্ত্র রাখা হয়।প্রতিদিন হতে থাকা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অন্য এক মাপ পাত্র দ্বারা মাপ করা হয়। এতে থাকা ইঞ্চি বা মিলিমিটার মাপের দাগ থেকে বৃষ্টির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

তুমি জান কি?

বৃষ্টিপাতের পরিমাণ জানার জন্য বৃষ্টিমাপক যন্ত্রে থাকা চোঙের মুখের ক্ষেত্রফল ও মাপ পাত্রের ক্ষেত্রফলের অনুপাত জানা আবশ্যক। মনে করো চোঙের মুখের ক্ষেত্রফল ১০০ বর্গ মিলিমিটার ও মাপ পাত্রের মুখের ক্ষেত্রফল ১০ বর্গ মিলিমিটার। সুতরাং এ দুটির অনুপাত ১০/১০০ মিমি = ১ ১০। যদি মাপ পাত্রের বৃষ্টির জলের উচ্চতা ২০ মিলিমিটার হয়, তবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১/১০×২০ মিমি =২ মিলিমিটার।

আবহাওয়ার পূর্ব সূচনা:

আমাদের নিত্যদিনের জীবনকে আবহাওয়া বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। কৃষিকার্য, সমুদ্রে মাছ ধরা ও জল স্থল তথা আকাশপথে যাতায়াতের অনুকূলতা জল হাওয়ার ওপর বিশেষ নির্ভর করে। সেইজন্য সরকার থেকে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র খুলে আবহাওয়ার আগাম সূচনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নিকট (বিগত কয়েকদিনের) অতীত ও বর্তমানের আবহাওয়ার অবস্থা বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতের যে পূর্বানুমান করা হয়, তাকে আবহাওয়ার পূর্ব সূচনা (ভাবী সূচনা) বলা হয়।আবহাওয়ার পূর্ব বা ভাবী সূচনা সাধারণত তিন শ্রেণীভুক্ত; যথা— (১) বর্তমানিক বা দৈনিক ভাবী সূচনা (Daily Forecasting) (২) স্বল্পকালীন ভাবী সূচনা (Short range forecasting); (৩) দীর্ঘকালীন ভাবী সূচনা (Long range forecasting).

(১) **বর্তমানিক বা দৈনিক ভাবী সূচনা:** এর দ্বারা অতি কম সময়ে অর্থাৎ ৬ ঘণ্টা থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঘটতে যাওয়া আবহাওয়ার সম্বন্ধে সূচনা দেওয়া।

(২) **স্বল্পকালীন ভাবী সূচনা:** এটা ৩ দিন বা ৭২ ঘণ্টার জন্য প্রতিদিন দু'বার করে দেওয়া হয়। এতে ঝড়, অত্যধিক বৃষ্টিপাত, হিমপাত, শিশিরপাত, বালি বা ধুলোর ঝড় ইত্যাদির সম্বন্ধে তথ্যের সূচনা থাকে।

(৩) **দীর্ঘকালীন ভাবী সূচনা:** এতে কোনো স্থান বা অঞ্চলের আগামী মাস, ঋতু কিংবা বছরের আবহাওয়ার সম্বন্ধে সূচনা দেওয়া হয়। এর জন্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তথা গাণিতিক সূত্র ব্যবহার করা হয়। আমাদের রাজ্যে প্রচলিত পঞ্জিকাতে গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদির অবস্থিতি ও সম্বন্ধ বিচার করে দীর্ঘকালীন আবহাওয়ার ভাবী সূচনা দেওয়া হয়ে থাকে।

বায়ুমণ্ডলের অবস্থা পরিবর্তনশীল। এতে হঠাৎ বড় ধরনের পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব নয়। সুতরাং জল হাওয়ার আগামী সূচনা সম্ভাবনা ভিত্তিক। তাই মাঝে মাঝে এটা ভুল বলে প্রমাণিত হয়ে থাকে। তবে, বন্যা ঝড় ও অনাবৃষ্টির প্রাক সূচনা আমাদের অনেক সম্ভাব্য বিপদ থেকে রক্ষা করে থাকে।

ভূমিরূপ:

পৃথিবীপৃষ্ঠ কাগজের মতো সমতল নয়। এতে পাহাড়, পর্বত, মালভূমি, সমতলভূমি, উপত্যকা ও বিস্তৃত সমুদ্র শয্যার মতো অনেক ভূমিরূপ আছে। এদের মধ্যে কিছু দ্বিতীয় ও কিছু তৃতীয় শ্রেণীর ভূমিরূপ বলে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু মুখ্য ভূমিরূপের বিশেষতার সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে।

পর্বত

(ক) **পাহাড় বা পর্বত:** নিকটবর্তী সমপ্রায়ভূমি থেকে হঠাৎ উপরে উঠে যাওয়া ভূমিদের পাহাড় বা পর্বত বলে। এ ধরনের ভূমিরূপের উচ্চতা ৩০০ মিটারের কম থাকলে তাকে পাহাড় ও ৩০০ মিটারের বেশি থাকলে তাকে পর্বত বলা হয়।

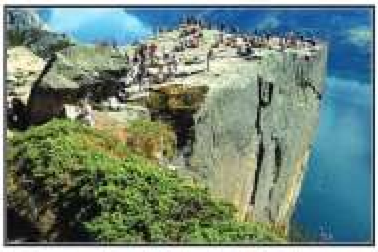

মালভূমি

(খ) **মালভূমি:** সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উচ্চে থাকা বিস্তৃত সমপ্রায়ভূমিকে মালভূমি বলা হয়। মালভূমি চতুষ্পার্শ্বস্থ সমতলভূমি থেকে হঠাৎ উপরে উঠে থাকে। তাই এর চারপাশে ঢালু বেশি। একে একটি বিস্তৃত টেবিলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

(গ) **উপত্যকা:** দুটি পাশাপাশি উচ্চভূমির মধ্যবর্তী নিম্নভূমিকে উপত্যকা বলা হয়। কিছু স্থানে এগুলো ইংরেজি অক্ষর U অথবা V আকৃতির হয়ে থাকে।

সেই জন্য এদের U উপত্যকা বা V উপত্যকা বলা হয়। ডড উপত্যকা মুখ্যত হিমবাহ এবং) উপত্যকা নদী দ্বারা সৃষ্টি হয় বলে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

'U' উপত্যকা

'V' উপত্যকা

(ঘ) গিরিপথ: কোনো পর্বতমালার শিখরের মধ্যবর্তী অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি দিয়ে ব্যবহৃত যাতায়াত পথকে গিরিপথ বলা হয়। গিরিপথ দিয়ে পর্বতমালার এক পাশ থেকে অন্য পাশে যাওয়া সম্ভব হয়। গিরিপথগুলি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে থাকে।

এছাড়া ভূপৃষ্ঠে আরও অনেক উচ্চ নীচ ভূমিরূপ আছে। এই সমস্ত ভূমিরূপকে মানচিত্রে সঠিকভাবে দেখানো খুব কষ্টকর ব্যাপার। কারণ কাগজের পৃষ্ঠা দুই মাত্রিক। এতে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে। কিন্তু ভূমিরূপগুলি তিন মাত্রিক। এতে দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা আছে। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন উঁচুনীচু ভূমি রূপকে মানচিত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে দেখানো হচ্ছে। তাদের মধ্যে (ক) রং পরস্তীকরণ ও (খ) সমোচ্চ রেখা প্রণালী বেশ আদৃত হতে পেরেছে।

(ক) রং পরস্তীকরণ: রঙের ঘনত্বে হ্রাস বৃদ্ধির দ্বারা বিভিন্ন ভূমিরূপ প্রদর্শন পদ্ধতিকে রং পরস্তীকরণ বলা হয়। মানচিত্রে উচ্চ অঞ্চলকে গাঢ় রং ও নিম্নভূমিগুলো অপেক্ষাকৃত হালকা রং দেওয়া হয়। সেই রকম সমুদ্রর গভীরতা দেখানোর জন্যও গাঢ় ও হালকা রং ব্যবহার করা হয়। মানচিত্রে লক্ষ করলে উপকূল থেকে সমুদ্রের ভেতরে নীল রঙের ক্রম পরিবর্তন লক্ষ করতে পারবে। এক্ষেত্রে অল্প গভীর অঞ্চল হালকা নীল এবং গভীর অঞ্চল গাঢ় নীল রঙে দেখানো হয়ে থাকে এই পদ্ধতিতে কোনো স্থানের প্রকৃত উচ্চতা সঠিকভাবে দেখানো যায় না।

(খ) সমোচ্চ রেখা: সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সমান উচ্চতাতে থাকা স্থানগুলোর মানচিত্রে যোগ করতে থাকা রেখাকে সমোচ্চরেখা বলা হয়। সমোচ্চ রেখাগুলো নির্দিষ্ট ব্যবধানে টানা হয়ে থাকে। যথা: ৫০ ফুট, ১০০ ফুট, ১৫ মিটার, ৩০ মিটার ইত্যাদি। এতে উচ্চতা ও ঢালু জানা সম্ভব হয়। সমোচ্চ রেখাগুলো কাছাকাছি থাকলে ঢালু বেশি হয়ে থাকে এবং ব্যবধান বেশি হয়ে থাকলে ঢালু কম হয়ে থাকে। তবে দুই সমোচ্চ রেখার মধ্যবর্তী স্থানের উচ্চতা নির্দিষ্ট ভাবে জানা যায় না। আবশ্যক ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট স্থানের উচ্চতা উল্লেখ করা হয়ে থাকে। একে স্থানিক উচ্চতা (Spot Height) বলা হয়। ভূমিরূপ প্রদর্শনে সমোচ্চরেখার ব্যাপক ব্যবহার করা হয়।

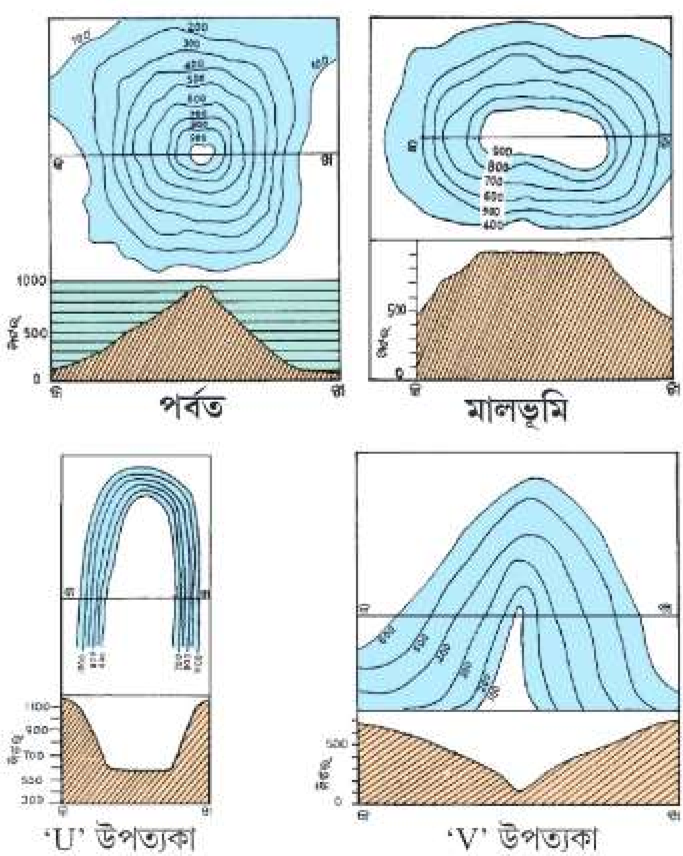

চিত্র ৫.৭. সমোচ্চ রেখার মাধ্যমে ভূমিরূপ প্রদর্শন।

প্রশ্নাবলী

১. **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখো।**

(ক) ব্যাবহারিক ভূগোল বলতে কী বোঝায়?

(খ) কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর তাপমাত্রার নিরবচ্ছিন্ন রেকর্ড সম্ভব?

(গ) কোন্ চাপমান যন্ত্রের বহুল ব্যবহার করা হয় ও কেন?

(ঘ) আপেক্ষিক আর্দ্রতা কী?

(ঙ) পবনের গতিবেগ মাপার জন্য কোন্ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়?

(চ) আবহাওয়ার আগামী সূচনা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

(ছ) স্বল্পকালীন ভাবী সূচনার আবশ্যকতা কী?

(জ) দীর্ঘকালীন ভাবী সূচনা কীভাবে সূচিত হয়ে থাকে?

(ঝ) সমোচ্চ রেখা কী?

২। **পার্থক্য দেখাও।**

(ক) হাইগ্রোমিটার ও অ্যানিমোমিটার।

(খ) দৈনিক ভাবী সূচনা ও স্বল্পকালীন ভাবী সূচনা।

৩। **সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী লেখো।**

(ক) পারদ চাপমান যন্ত্র।

(খ) বৃষ্টিমাপক যন্ত্র।

(গ) রং পরস্তীকরণ।

৪। **বন্ধনী থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে শূন্যস্থান পূরণ করো।**

(ক) ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বায়ুর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা জানার জন্য ব্যবহৃত তাপমান যন্ত্র ইংরেজি অক্ষর__________ আকৃতি বিশিষ্ট।

(i) V (ii) U (iii) W (iv) X

(খ) সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুচাপ __________ সেন্টিমিটার পারদস্তম্ভের উচ্চতার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে। ।
(৭০, ৭৬, ৮০, ৮৬)

(গ) হাইগ্রোমিটার যন্ত্র বায়ুর __________ মাপতে সাহায্য করে।
(দিক, বেগ, আর্দ্রতা, শুষ্কতা)।

মানবীয় পরিবেশ
জনবসতি পরিবহন ও যোগাযোগ

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানবীয় পরিবেশের বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে মনুষ্যকৃত (Human made) কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষ নিজের সুখ সুবিধের জন্য জ্ঞান ও কারিগরি কৌশলের সাহায্যে প্রাকৃতিক পরিবেশে কিছু পরিবর্তন এনেছে। এই মনুষ্যকৃত পরিবেশকে 'মানবীয় পরিবেশ' বা 'সাংস্কৃতিক পরিবেশ' বলা হয়।

মানুষ প্রথমে গাছে এবং পাহাড়ের গুহায় বাস করত। তারা জঙ্গল থেকে শিকার করে, গাছের ফলমূল খেয়ে এবং নদী থেকে মাছ ধরে তার খাদ্যের আবশ্যকতা পূরণ করত।

তোমার জন্য কাজ:

তোমার পরিবেশে থাকা বিভিন্ন উপাদানগুলোর মধ্যে কোন্‌গুলো মনুষ্যকৃত ও কোন্‌গুলো প্রাকৃতিক তাদের তালিকা করো।

জনবসতি:

মানুষের জীবন ধারণের জন্য খাদ্য ও বস্ত্রের মতো বাসগৃহ ও একটি মৌলিক আবশ্যকতা। আদি মানব মুখ্যত জঙ্গল থেকে ফলমূল সংগ্রহ করে এবং পশুপাখি শিকার করে নিজের এবং পরিবারের ক্ষুধা নিবারণ করত। খাদ্য অন্বেষণে তাকে বিভিন্ন স্থানে যেতে হত এবং আবশ্যক হলে সেখানে অস্থায়ীভাবে বাস করতে হত। একে 'অস্থায়ী জনবসতি' বলা হয়। কালক্রমে মানুষ কৃষিকার্য শিখল, কৃষিকাজ শ্রম ভিত্তিক হওয়ায় তাকে পরিবারের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের কাছে থাকতে হল। এর ফলে কৃষিকার্য সুচারুরূপে করা এবং বেশি হওয়া কৃষিজাত দ্রব্য জমিয়ে রাখার জন্য স্থায়ী গৃহ নির্মাণ করার দরকার হল। মানুষকে এইভাবে নিজের পরিবারের সঙ্গে ও অন্যান্য পরিবারের সঙ্গে স্থায়ীভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে হল। এর ফলে স্থায়ী জনবসতির সৃষ্টি হল। কৃষির উপর নির্ভর করে স্থাপিত হওয়া এই প্রকার জনবসতিকে গ্রাম্য জনবসতি বলা হয়। কৃষিকার্যের জন্য জলের সুলভতা এবং উর্বর মৃত্তিকার

তোমার জন্য কাজ:

মানুষ প্রাচীনকালে খোলাস্থানে, গাছে ও পর্বত গুহায় থাকার ফলে কী প্রকার অসুবিধের সম্মুখীন হত আলোচনা করে লেখো।

মনে করো

প্রাচীনকালে কোন্ কোন্ নদী উপত্যকায় কোন্ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, সেগুলোর নাম লেখো।

আবশ্যক হওয়া হেতু নদী উপত্যকা অঞ্চলে অনেক জনবসতি স্থাপিত হল। কৃষিজাত পদার্থ এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় বস্তুর আদান প্রদানের জন্য ব্যবসায়, বাণিজ্য, গমনাগমন, পথের বিকাশ হল। অধিক সংখ্যক লোকের খাদ্যবস্তু গৃহ উপকরণ ইত্যাদি আবশ্যকতা পূরণ করার জন্য উৎপাদন শৈলীতে পরিবর্তন করা হল। একে কেন্দ্র করে পৃথিবীর অনেক উন্নত সভ্যতা পৃথিবীর বিভিন্ন নদী উপত্যকায় গড়ে উঠল। তার জন্য উৎপাদন কেন্দ্র, বিভিন্ন ব্যবসা ও বাণিজ্য কেন্দ্র, সেবা কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপিত হল। এই ধরনের জনবসতিকে **শহর বা নগর জনবসতি** বলা হয়। সেই জন্য প্রাচীন কালে, পৃথিবীর বিভিন্ন নদী উপত্যকাগুলিতে নগর সভ্যতার বিকাশ লাভ করেছিল।

চিত্র ৬.১: জনবসতি।

অস্থায়ী জনবসতি:

অস্থায়ী জনবসতিগুলো সাধারণত পার্বত্য ও মরুভূমি অঞ্চল বরফময় তুন্দ্রা অঞ্চল ও ঘন অরণ্য থাকা অঞ্চলে দেখা যায়। এই অঞ্চলে লোকেরা সাধারণত স্থায়ী গৃহ নির্মাণ করেন না। খনি অঞ্চলে ও ইটভাটায় কাজ করতে থাকা লোকেরা অস্থায়ী জনবসতি করে বাস করে থাকে। এসব অঞ্চলের লোকেরা অরণ্য থেকে ফলমূল সংগ্রহ, পশুপাখি শিকার, ইট তৈরি ইত্যাদি কার্য করে চলে।

স্থায়ী জনবসতি: সাধারণত যে অঞ্চলে অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জলবায়ু, জলের সুলভতা, উপযুক্ত ভূমি উর্বর মৃত্তিকা, ব্যবসা, বাণিজ্য, গমনাগমন ও সেবাকেন্দ্র থাকে সেখানে স্থায়ী জনবসতি দেখা যায়।

গ্রাম্য জনবসতি:

গ্রাম্য জনবসতিতে বাস করতে থাকা লোকেরা কৃষি, মৎস্য চাষ, পশু শিকার, অরণ্যজাত দ্রব্য সংগ্রহ, বিভিন্ন কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা করে জীবন যাপন করে থাকে। গ্রাম্য জনবসতিতে ঘরগুলো পরস্পরের সঙ্গে লাগালাগি হয়ে গড়ে উঠলে তাকে সঘন গ্রাম্য জনবসতি ও ঘরগুলো আলাদা আলাদা দূরে থাকলে তাকে **অপখণ্ডিত গ্রাম্য জনবসতি** বলা হয়।

চিত্র ৬.২: বিক্ষিপ্ত জনবসতি

চিত্র ৬.৩: সঘন জনবসতি

কোনো অঞ্চলের গ্রামগুলো পরস্পরের সঙ্গে লাগালাগি হয়ে থাকলে তাকে সকেন্দ্রিক জনবসতি ও আলাদা আলাদা ভাবে দূরে অবস্থিত থাকলে তাকে বিক্ষিপ্ত জনবসতি বলা হয়। রাস্তার উভয় পার্শ্বে ঘরগুলো সারি দিয়ে থাকলে তাকে রৈখিক জনবসতি বলা হয়। আমাদের দেশের উর্বর পলিমাটি বিশিষ্ট উর্বর সমতল অঞ্চলে সমান ও সমকেন্দ্রিক গ্রাম্য জনবসতি দেখতে পাওয়া যায়। এসব জায়গায় জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি। কিন্তু অপখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত জনবসতিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব সাধারণত কম থাকে এবং এখানে লোকেরা প্রধানত পশুপালন ও জঙ্গলজাত দ্রব্য সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এ ধরনের জনবসতি সাধারণত পার্বত্য অঞ্চল ঘন জঙ্গল এবং প্রতিকূল পরিবেশে দেখা যায়।

চিত্র: ৬.৪: মাচার উপর বাসগৃহ।

গ্রাম্য জনবসতিতে লোকেদের বাসগৃহগুলি পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নির্মিত হয়। অত্যধিক বৃষ্টিপাত হতে থাকা অঞ্চলে বাস করতে থাকা লোকেরা তাদের ছাদ খুব ঢালু করে তৈরি করে। সেইরকম যেসব স্থানে বর্ষাকালে জল জমা হয়ে যায়, সেইসব স্থানের অধিবাসীরা ঘরগুলো উঁচুতে বা মাচার উপরে নির্মাণ করে থাকে। উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের লোকেরা মাটির মোটা মোটা দেওয়াল এবং খড় দিয়ে ছাউনির ঘর তৈরি করে থাকে।

শহরাঞ্চল জনবসতি:

শহর বা নগরের জনবসতি সঘন সকেন্দ্রিক এবং ব্যাপক হয়ে থাকে। এই শহর জনবসতিতে লোকেরা উৎপাদন, ব্যবসা, বাণিজ্য, সরকারি ও

বেসরকারি সেবার ক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়ে থাকেন এবং এর জনসংখ্যা পাঁচ হাজারের বেশি হয়ে থাকে। জনসংখ্যা এক লক্ষের বেশি হলে শহরকে নগর বলা হয়।

তোমার জন্য কাজ

প্রদত্ত সারণী-১-কে নিজের খাতায় করে তোমার রাজ্যের কিছু গ্রাম, শহর ও নগরের নাম লেখো।

সারণী-১

গ্রাম	শহর	নগর
১.	১.	১.
২.	২.	২.
৩.	৩.	৩.
৪.	৪.	৪.
৫.	৫.	৫.

জনসংখ্যার ঘনত্ব:

কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বাস করতে থাকা লোকেদের সেই দেশের জনসংখ্যা বলা হয়। দেশের মোট জনসংখ্যাকে তার ক্ষেত্রফল দ্বারা ভাগ করলে প্রতিবর্গ কিলোমিটারে বাস করতে থাকা মোটামুটি জনসংখ্যাকে সেই দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বলা হয়। এর দ্বারা দেশের ভূমি-জন অনুপাত সূচিত হয়ে থাকে। জনসংখ্যার ঘনত্ব অনুযায়ী পৃথিবীর কিছু অঞ্চল জনবহুল হয়ে থাকে ও কিছু অঞ্চল জনবিরল হয়। ভূমির গঠন, জলবায়ু, পরিবেশ সম্পদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণের উপরে জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ভর করে থাকে। শিল্পাঞ্চল, খনি অঞ্চল, শাসন কেন্দ্র, বাণিজ্য কেন্দ্র, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র এবং প্রসিদ্ধ ধর্মপীঠ থাকা স্থানগুলোয় জীবিকার্জনে অধিক সুযোগ থাকায় সে অঞ্চলগুলো জনবহুল। চীন, ভারত, জাপান, কোরিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রেটবিটেন, বেলজিয়াম, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশগুলি পৃথিবীর জনবহুল দেশ। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, সাহারা মরু অঞ্চল, গ্রিনল্যান্ড বা সাইবেরিয়ার বরফাঞ্চল আমাজন নদী উপত্যকা বা কঙ্গো নদীর উপত্যকার ঘন অরণ্য অঞ্চল এবং হিমময় অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের বরফ অঞ্চল জীবন ধারণের জন্য অনুকূল পরিবেশ না হওয়াতে এইসব অঞ্চল প্রায়ত জনবিরল।

তোমার জন্য কাজ:

প্রদত্ত সারণী-২-কে নিজের খাতায় করে জনসংখ্যা ও জনসংখ্যার ঘনত্বের দৃষ্টিতে পৃথিবীর দেশ, ভারতের রাজ্য ও ওড়িশার ১০টি জেলার নাম লেখো।

পরিবহন:

বিভিন্ন সামগ্রী কিংবা যাত্রীদের একস্থান থেকে অন্যস্থানে আনা-নেওয়ার প্রক্রিয়াকে পরিবহন বলে। যার দ্বারা বহন কার্য করা হয় তাকে যান বা বাহন বলে। গোরুর গাড়ি, রিকশা, গাড়ি, বাস, ট্রাক,রেলগাড়ি, নৌকা, উড়োজাহাজ, হেলিকপ্টার প্রভৃতি বিভিন্ন যানবাহনের উদাহরণ।

সারণী-২

পৃথিবী			ভারত			ওড়িশা		
দেশের নাম	জনসংখ্যা	জনসংখ্যার ঘনত্ব	রাজ্যের নাম	জনসংখ্যা	জনসংখ্যার ঘনত্ব	জেলার নাম	জনসংখ্যা	জনসংখ্যার ঘনত্ব

যানবাহন বিভিন্ন প্রকার পথের মধ্যে দিয়ে পরিবহন প্রক্রিয়া সাধন করে থাকে। এদেরকে পরিবহন পথ বলা হয়। এই প্রক্রিয়া স্থলপথ, জলপথ, আকাশপথের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কোনো দেশের আর্থিক বিকাশে উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা সহায়ক হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থা দ্বারা লোকেরা সহজে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমনাগমন করে থাকে। পণ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল এক স্থান থেকে অন্যস্থানে সহজেই নিয়ে যাওয়া যায়। অতীতে দুটি স্থানে যাতায়াত করতে অনেক সময় লাগত। কিন্তু আজকাল পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যে কোনো স্থানে খুব কম সময়ে যাতায়াত করা যাচ্ছে।

চিন্তা করে লেখো:

স্লেজ গাড়ির চাকা নেই কেন?

প্রাচীনকালে পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে গরু-বলদ, ঘোড়া, হাতি, উট, গাধা, খচ্চর, চমরী গাই ইত্যাদি ব্যবহার করা হত। আজকালও কিছু জায়গায় ঘোড়া, গাধা, বলদ, উট, খচ্চর ইত্যাদি পশুকে ভার বহনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। দক্ষিণ আমেরিকার আন্ডিজ পর্বতমালা অঞ্চলে লামা, হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে খচ্চর ও তিব্বতে চমরী গাইকে ভারবাহী পশুরূপে ব্যবহার করা হয়। উট মরুভূমিতে

চিত্র ৬.৪: ঘোড়ার গাড়িতে পরিবহন ব্যবস্থা।

চিন্তা করে লেখো:

উটকে মরুভূমির জাহাজ কেন বলা হয়?

তোমার জন্য কাজ:

তোমার বিদ্যালয়ের যে ছাত্রছাত্রী দূরে গেছে তাদের কাছ থেকে বুঝে তাদের ব্যবহার করা পরিবহন মাধ্যমগুলি লেখো।

তুমি জান কি?

ভারতে অনেক জাতীয় রাজপথ ও রাজ্য রাজপথ রয়েছে। নিকট অতীতে **সোনালি চতুর্ভুজ** যোজনার মাধ্যমে ভারতের চার বৃহৎ নগরী দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই ও কলকাতাকে সংযোগ করে জাতীয় রাজপথের সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

পরিবহনের একটি প্রধান মাধ্যমরূপে কার্য করে। তাই উটকে 'মরুভূমির জাহাজ' বলা হয়। গ্রিনল্যান্ড ও তুন্দ্রা অঞ্চলে কুকুর ও বল্গা হরিণের দ্বারা স্লেজ গাড়িতে পরিবহনের কাজ করা হয়। থাইল্যান্ডের অধিবাসীরা হাতিকে উভয় পরিবহন ও গমনাগমন কাজে ব্যবহার করে থাকে। যানবাহনের প্রকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন পথ দরকার হয়। বলদগাড়ি, রিকশা, কার, বাস ইত্যাদি সড়ক পথে চলে। রেলগাড়ি রেলপথে চলে। নৌকা জাহাজ জলপথে চলে। উড়োজাহাজ, হেলিকপ্টার আকাশপথে চলে। তাই তিনপ্রকার পরিবহনের ব্যবস্থা দেখা যায়। স্থল পরিবহন, জল পরিবহন ও আকাশ পরিবহন।

আগের কালে বণিকদের ভারতে পৌঁছতে স্থলপথে বা জলপথে মাসের পর মাস সময় লাগত। কিন্তু বর্তমানে উড়োজাহাজ ও জেটবিমানে অধিক ক্ষিপ্রতর হতে পেরেছে। আজকাল ভারত থেকে পৃথিবীর যে কোনো দেশে যাত্রা করতে খুব কম সময় লাগছে।

স্থল পরিবহন:

স্থল পরিবহন প্রধানত সড়ক পরিবহন ও রেল দ্বারা পরিবহন করা হয়ে থাকে।

সড়ক পরিবহন:

সড়ক পথ দেশের প্রত্যেক গ্রাম ও শহর জনবসতি এবং অন্যান্য স্থানের সঙ্গে সংযোগ করে থাকে। এর দ্বারা অল্প তথা মধ্যম দূরত্বের মধ্যে যাত্রী তথা মাল পরিবহনের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে। কাঁচা সড়ক ও পাকা সড়ক---এরকম দু'প্রকার সড়ক দেখা যায়। সড়ক পথের মাধ্যমে লোকেদের বাসগৃহের সঙ্গে কার্যালয়, বাজার, কলকারখানা চিকিৎসালয়, শিক্ষানুষ্ঠান প্রভৃতি সমস্ত স্থান সংযুক্ত হয়ে থাকে। তাই এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র ৬.৬: পাকা সড়ক

চিত্র ৬.৭: কাঁচা সড়ক।

Value : 1 : 15000 000

চিত্র. ৬.৮: সড়ক পরিবহন (ভারত)

তোমার জন্য কাজ:

আমাদের রাজ্য দিয়ে কোন্ কোন্ রাজপথ (জাতীয় গেছে, মানচিত্র দেখে বের করো এবং তার এক তালিকা করো।

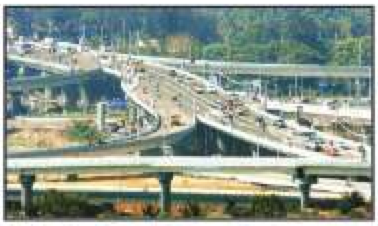

চিত্র ৬.৯ ফ্লাইওভার

তুমি জানো কি?

তিব্বতের মালভূমিতে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪০০০ মিটার উপরে জিনজিয়াং থেকে লাসা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করে।

তোমার জন্য কাজ

মানচিত্র দেখে রেল পথ মণ্ডল ও তার সদর মহকুমার এক তালিকা প্রস্তুত করো।

বিভিন্ন প্রকার সড়কপথ আছে। সেগুলো হল—জাতীয় রাজপথ, রাজ্য রাজপথ, মুখ্যজেলা সড়ক, অন্যান্য গৌণ সড়ক, গ্রামীণ সড়ক, সীমান্ত সড়ক ইত্যাদি। জাতীয় রাজপথগুলো বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানী, বন্দর আমাদের দেশের মুখ্য শহরের সঙ্গে সংযুক্ত করে থাকে। এগুলো কেন্দ্র সরকারের দায়িত্বে পরিচালিত হয়ে থাকে। রাজ্য রাজপথ রাজ সরকারের অধীন কার্য করে। এগুলো সম্পৃক্ত রাজ্যের রাজধানীকে বিভিন্ন জেলার সদর মহকুমা প্রধান শহর ও শিল্প কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে থাকে। প্রধান জেলা সড়ক সম্পৃক্ত জেলার সদর মহকুমাকে জেলার বিভিন্ন শহর ও বড় বড় গ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত করে থাকে। অন্যান্য গৌণ জেলা সড়ক প্রধান জেলা সড়কের সঙ্গে সংযোগ করে থাকে। গ্রাম্য রাস্তাগুলো বিভিন্ন গ্রামগুলোকে সংযোগ করে থাকে। আমাদের দেশের এদের মধ্যে কিছু কাঁচা থাকার সময় কিছু এখন প্রধানমন্ত্রী গ্রাম্য সড়ক যোজনায় পাকা সড়কে পরিণত হয়েছে।

এছাড়া দেশের সীমান্ত অঞ্চলে সীমান্ত সড়কগুলি আছে। এগুলো সীমান্ত সড়ক সংস্থা দ্বারা নির্মিত, পরিচালিত ও সংরক্ষিত হয়ে থাকে। হিমাচলপ্রদেশের মানালি থেকে লাদাখের লেহ পর্যন্ত যাওয়া পৃথিবীর উচ্চতম সড়ক এই সীমান্ত সড়কের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

জনবহুল পূর্ণ অঞ্চলগুলোয় সড়ক পারাপারের জন্য ভূনিম্নে কিছু রাস্তা নির্মাণ করা হয়। তাদের ভূতল সড়ক বা উপসড়ক বলে। সেই রকম বৃহৎ নগরীগুলোয় জনবহুলপূর্ণ রাস্তার একদিক থেকে অন্যদিকে বা অন্য রাস্তায় যাওয়ার জন্য সড়ক থেকে উঁচুতে ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়।

রেলপথ:

রেলপথের দ্বারা অধিক ওজন বিশিষ্ট এবং অধিক পরিমাণে পণ্যদ্রব্য, কাঁচামাল এবং অধিক সংখ্যক যাত্রী বহন করা এবং দ্রুতগতিতে এবং কম খরচে হয়। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের উদ্ভাবন ও শিল্প বিপ্লব রেল পরিবহনের দ্রুত বিকাশে অনেক সাহয্য করেছে। কালক্রমে ডিজেল ইঞ্জিন ও বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন ব্যবহারের ফলে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের পরিবর্তে এদের দ্বারা কম খরচে ও প্রদূষণ হ্রাস করে যাতায়াতের সুবিধা হচ্ছে।

চিত্র. ৬.১০: রেল পরিবহন (ভারত)

তোমার জন্য কাজ

তোমার রাজ্যে যাওয়া রেলপথগুলির নাম লেখো।

অত্যাধুনিক বৈষয়িক জ্ঞান কৌশলের ব্যবহারের ফলে পার্বত্য অঞ্চলেও রেলপথ নির্মাণ করা যেতে পারছে। কিন্তু সেগুলোর সংখ্যা কম। পরিবহন ক্ষিপ্রতর করার জন্যে রাজধানী এক্সপ্রেস করমণ্ডল এক্সপ্রেস প্রভৃতি অতিদ্রুতগামী (super fast) রেলের ব্যবহার করা হচ্ছে।

ভারতের রেলপথ এশিয়ার বৃহত্তম ও পৃথিবীর চতুর্থতম বৃহৎ রেলপথ। ভারতে ১৮৫৩ সালে মুম্বই থেকে থানে পর্যন্ত প্রায় ৩৪ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথে প্রথম রেলগাড়ি চলে রেল পরিবহনের শুভারম্ভ হয়েছিল। আমাদের দেশে তিন প্রকার গেজ বিশিষ্ট রেলপথ আছে। সেগুলো হচ্ছে ব্রডগেজ, মিটার গেজ আর ন্যারো গেজ। পরিচালনার সুবিধের জন্য দেশের সমগ্র রেলপথকে ১৬টি মণ্ডলে ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে পূর্বতট রেলপথ মণ্ডল ওড়িশায় কার্যরত। রাশিয়ার ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ। এটা পূর্বস্থ প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে ভ্লাডিভস্টক বন্দর থেকে পশ্চিমস্থ সেন্ট পিটার্সবার্গ পর্যন্ত প্রায় ৯৬০০ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত।

চিত্র ৬.১১: ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ

চিত্র ৬.১২ মেট্রোরেল

আমাদের দেশে কলকাতা ও দিল্লিতে **মেট্রো রেলের** সাহায্যে ও পরিবহন ব্যবস্থা কার্যরত রয়েছে। মেট্রোরেল প্রায়শ ভূগর্ভস্থ রেলপথ দিয়ে যাতায়াত করে।

জলপথ:

প্রাচীনকাল থেকেই জলপথকে পরিবহনের এক মুখ্য মাধ্যম ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ওজনদার এবং বৃহদাকার বিশিষ্ট পদার্থ অন্য স্থানে তথা অন্যদেশে পরিবহন করার জন্য এটা সুলভ মাধ্যম। জলপথ প্রধানত দুই প্রকার যথা: অভ্যন্তরীণ জলপথ ও সমুদ্রপথ।

অভ্যন্তরীণ জলপথ:

দেশের মধ্যে থাকা সুনাব্য নদী, হ্রদ, ক্যানেলের মধ্যে দিয়ে অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে থাকা বৃহৎ নদীগুলির মধ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মহানদী, কাবেরী ইত্যাদি নদীর মধ্যে দিয়ে অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন হয়ে থাকে। আমাদের রাজ্যের চিলিকা হ্রদের মধ্যে থাকা পারিকুদ,

চিত্র ৬.১৩: অভ্যন্তরীণ জলপথে পরিবহন

চিত্র ৬.১৪: জাহাজ পরিবহন

মালুদ, কালিজ্যাই ইত্যাদি স্থানে যাবার জন্য লোকেরা জলপথে লঞ্চ, স্টিমার, নৌকা ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। উত্তর আমেরিকীয় বৃহৎ হ্রদের মধ্যে এবং আফ্রিকার নীল নদে থাকা জলপথ পৃথিবীর প্রধান অভ্যন্তরীণ জলপথের মধ্যে অন্যতম।আমদের রাজ্যে তালদন্ডা ক্যানেল, পট্টামুন্ডাই ক্যানেল ইত্যাদি ক্যানেল দ্বারা উপকূলবর্তী অঞ্চলে জল পরিবহনের ব্যবস্থা রয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর বাকিংহ্যাম ক্যানেল, কেরলের কিছু ক্যানেলের দ্বারা ও জল পরিবহন হয়ে থাকে।

তোমার জন্য কাজ:

ভারতের একটি রেখাঙ্কিত মানচিত্রে মুখ্য বন্দরগুলি দেখাও।

সমুদ্রপথ:

সামুদ্রিক পরিবহন সমুদ্র পথের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। সমুদ্র পথগুলি প্রধানত একদেশ থেকে অন্যদেশে গুরুযন্ত্রপাতি, কৃষিজাত পদার্থ এবং অন্যান্য পদার্থ পরিবহন কার্যে ব্যবহার করা হয়। এগুলো বিভিন্ন দেশের

চিত্র. ৬.১৫: বায়ুমার্গ এবং জলমার্গ পরিবহন (ভারত)

বন্দরগুলোকে সংযুক্ত করে থাকে। এশিয়ার সিঙ্গাপুর, মুম্বই, উত্তর আমেরিকার নিউইয়র্ক এবং লসএঞ্জেলস, দক্ষিণ আমেরিকার রিওডিজেনেরিও, অস্ট্রেলিয়ার সিডনি, এবং ইউরোপের লন্ডন ও রোটারড্যাম ইত্যাদি পৃথিবীর প্রধান প্রধান বন্দর। আমাদের রাজ্যের পারাদ্বীপ এক মুখ্য বন্দর। এছাড়া গোপালপুর, ধামরা ও চান্দবালিতে পরিবহনের জন্য পোতাশ্রয়ের সুবিধে আছে। মুম্বই, কলকাতা, চেন্নাই, পারাদ্বীপ, বিশাখাপত্তনম, কোচিন, কান্ডলা ইত্যাদি ভারতের মুখ্য বন্দর।

ভারতের সামুদ্রিক বাহির্বাণিজ্য মুখ্যত চারটি সমুদ্রপথের মাধ্যমে করা হয়। ইউরোপ মহাদেশের দেশের সঙ্গে **সুয়েজ ক্যানেলের** পথ দিয়ে ভারত বাণিজ্য করে থাকে। পশ্চিম আফ্রিকার দেশ ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির সঙ্গে **উত্তমাশা অন্তরীপ** দিয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, জাপান, আমেরিকা ও কানাডার সঙ্গে **সিঙ্গাপুর সমুদ্রপথ** দিয়ে এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে **অস্ট্রেলিয়া** পথ দিয়ে বাণিজ্য কারবার করা হয়।

আকাশপথ:

আকাশপথ সব থেকে দ্রুতগামী পরিবহন মাধ্যম। এতে ব্যবহৃত ইন্ধনের মূল্য বেশি হেতু এই পরিবহনে যাতায়াত খরচ বেশি। কুয়াশা বা ঝড়ের ফলে আবহাওয়ায় ব্যতিক্রম হলে আকাশপথে পরিবহন বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। সড়ক ও রেলপথের সুবিধে না থাকা সুদূর অগম্য স্থানেও হেলিকপ্টার দ্বারা যাওয়া যায়। বন্যা, ভুমিকম্প ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় বিভিন্ন লোকেদের রিলিফ্ খাদ্য, জল ও পোশাক তথা ওষুধ বণ্টন করার জন্য হেলিকপ্টার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এর দ্বারা যুদ্ধ, বন্যার সময়ে বিপন্নকে উদ্ধার করা হয়। পৃথিবীর প্রধান বিমান বন্দরগুলি হল দিল্লি, মুম্বই, নিউইয়র্ক, লন্ডন, প্যারিস, ফ্রাঙ্কফুট, কাইরো ইত্যাদি। দিল্লির পালাম (ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর) কলকাতার দমদম, মুম্বই সান্তাক্রুজ (ছত্রপতি শিবাজী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর) চেন্নাইয়ের মীনাম্বকম এবং কেবলেব থিরুঅনন্তপুরম আমাদের দেশের

চিত্র ৬.১৬: হেলিকপ্টার

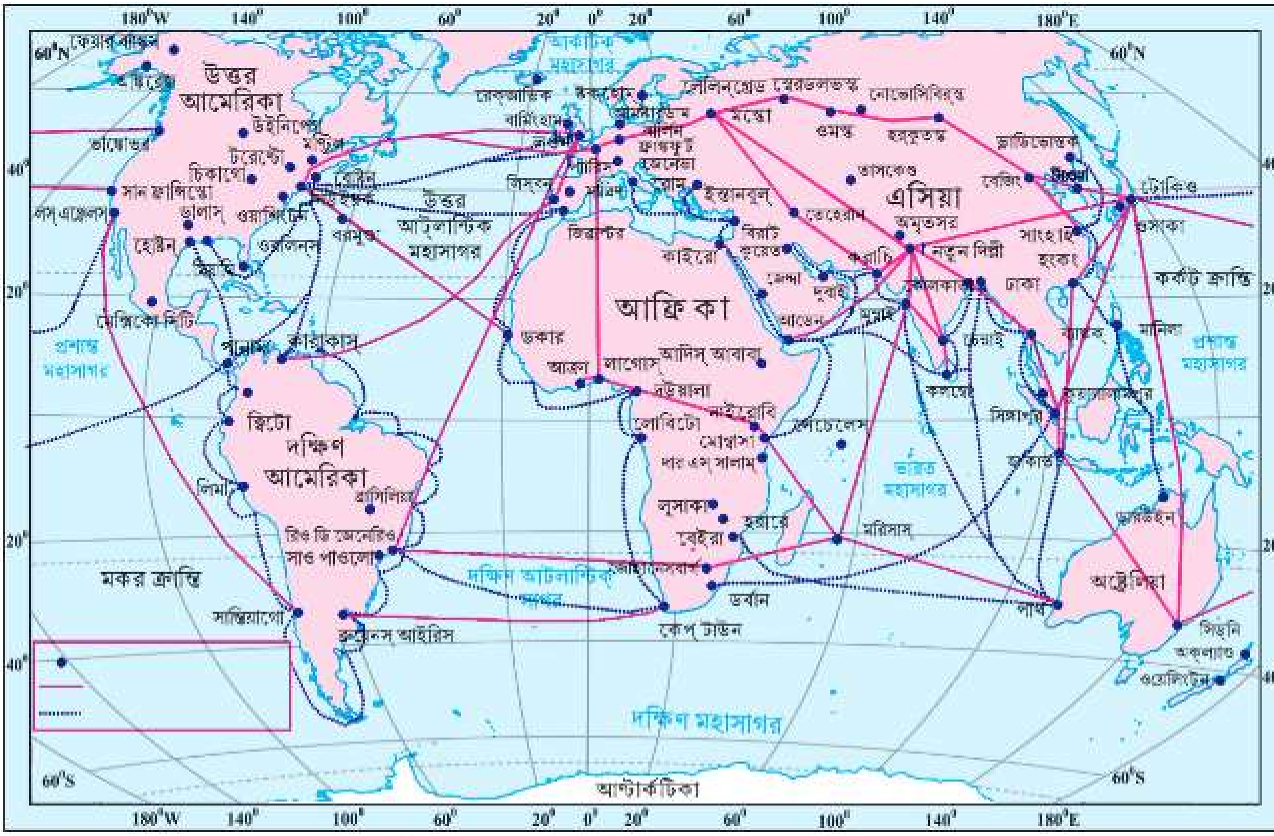

চিত্র ৬.১৭: পৃথিবীর মুখ্য বন্দর ও বিমান বন্দর

তোমার জন্য কাজ

পরিবহনের বিভিন্ন মাধ্যমের চিত্র সংগ্রহ করে একটি পুস্তিকা প্রস্তুত করো।

আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। আমাদের রাজ্যের রাজধানী ভুবনেশ্বর বিজু পট্টনায়ক আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর রয়েছে। এখান থেকে সোজা কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, বিশাখাপত্তনম, বেঙ্গালুরু প্রভৃতি স্থানে বিমানে যাত্রা করা যাচ্ছে।

যোগাযোগ:

নিকটে না থাকা লোকের কাছে না গিয়ে যে যে মাধ্যমের সহায়তার লোকে পরস্পরের খবরাখবর বা ভাবের আদান প্রদান করে থাকে। কিংবা বিভিন্ন তথ্যর সম্বন্ধে জানতে পেয়ে থাকে, তাকে যোগাযোগ বলা হয়। আগেকার দিনে যোগাযোগ স্থাপন করার মাধ্যম সীমিত ছিল। এবং কষ্টসাধ্য ছিল। কিন্তু আজকাল বৈষয়িক বিজ্ঞানের বিকাশের ফলে অনেক নূতন তথা ক্ষিপ্রতর যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য ও ভাব পরিবেশন করা যাচ্ছে।

অতীতে সংবাদ প্রেরণ কোনো ব্যক্তির দ্বারা বা পায়রার সাহায্যে করা হত। রাজারা তাদের যুদ্ধ জয়ের খবর কোনো উচ্চস্থানে আগুন জ্বেলে কিংবা

তাঁর আদেশ বা নির্দেশে রাজ কর্মচারীরা বাদ্য বা ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে রাজ্যবাসীকে জানাত।

এর পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ডাকসেবা কার্য আরম্ভ হল। ১৮৫৪ সালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ডাক ও তার বিভাগের মাধ্যমে উভয় ডাকসেবা ও তার সেবা আরম্ভ হল। কিন্তু ১৯৮৪ সালে ডাক ও তার বিভাগকে ডাক বিভাগ ও দূর সঞ্চার এই রকম দুটি বিভাগে বিভক্ত করা হল। ডাক বিভাগের দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে চিঠিপত্র বিলি করা হল এবং মানি অর্ডার ব্যবস্থা ও ডাকঘর জীবন বিমা ব্যবস্থাকে কার্যকরী করা হল। ডাকের সঠিক ও দক্ষ বিতরণের জন্য ১৯৭২ সালে আমাদের দেশে ছয় অঙ্ক বিশিষ্ট **ডাকপিন কোড** ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হল।

তোমার জন্য কাজ:

নিম্ন চিত্র থেকে অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থায় কী প্রকার বিকাশ হয়েছে দেখো এবং তার গুরুত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ করো।

বিভিন্ন ভাষায় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়ে যোগযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এল। আমাদের দেশে মুম্বই থেকে প্রকাশিত গুজরাটি সংবাদপত্র দৈনিক বম্বে সমাচার সর্বপ্রথম সংবাদপত্র। ১৮৬৬ সালে গৌরীশঙ্কর রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত উৎকল দীপিকাকে ওড়িশার প্রথম সংবাদপত্র হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আমাদের দেশে ৩৫টি ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। হিন্দি ভাষায় সর্বাধিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইংরেজি ভাষাতেও অনেক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রকাশিত হয়ে থাকে।

দূর সঞ্চারের মাধ্যমে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হল। ১৮৫১ সালে কলকাতা ও ডায়মন্ড হারবারের মধ্যে প্রথম টেলিগ্রাফ সেবা এবং ১৮৮১ সালে প্রথম টেলিফোন সেবা আরম্ভ হয়েছিল। এর দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হল। এছাড়া টেলেকস্ সেবাও প্রচলন করা হয়েছে। সেইরকম বেতার বা **রেডিওর** মাধ্যমে দেশ বিদেশের সংবাদ পরিবেশন করা হল। ভারতে ১৯৩৬ সালে একে **ভারতীয় বেতার** ও ১৯৫৭ থেকে **আকাশবাণী** নামে নামিত করা হল।

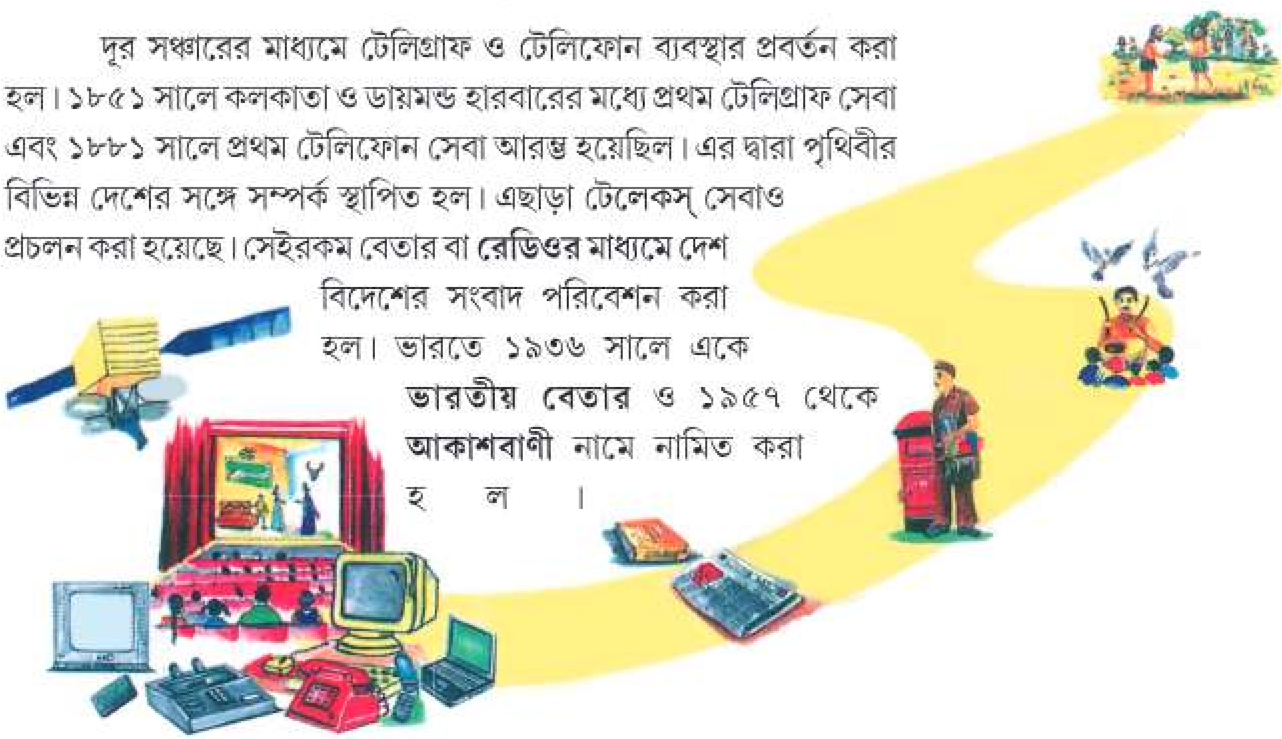

চিত্র ৬.১৮: যোগাযোগ (সঞ্চার) ব্যাবস্থার বিকাশ

তোমার জন্য কাজ:

তোমার জানা দূরদর্শনের চ্যানেলগুলির তালিকা করো এবং সেই চ্যানেলে সম্প্রচারিত যেসব কার্যক্রম তোমার ভালো লাগছে লেখো।

জেনে রাখো:

পৃথিবীতে তথ্যসঞ্চার ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টিকারী সর্বশেষ মাধ্যম হচ্ছে ইন্টারনেট। এর দ্বারা যে কোনো বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য আমরা পেতে পারি। ছাত্রছাত্রী, গবেষক, শিক্ষাবিদদের জন্য এটি জ্ঞানের ভাণ্ডারের কাজ করে। এর উপযোগ করে যে কোনো ব্যক্তির কাছে ইলেকট্রনিক মেইল বা ই-মেইল পাঠানো যেতে পারে। ইন্টারনেটের সাহায্যে রেলে স্থান সংরক্ষণ, বিমানে স্থান সংরক্ষণ, হোটেলে এবং প্রেক্ষালয়েও স্থান সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবার ব্যবহার করে ঘরে বসে ক্রয়-বিক্রয়, ফোন বিল, বিদ্যুৎ বিল জমা কার্যও করা যেতে পারছে।

ওয়ারলেস ও **ফ্যাক্স** দ্বারাও সংবাদ প্রেরণ সহজ ও ত্বরান্বিত হতে পারল। টেলিভিশনের মাধ্যমে সংবাদ পরিবেশন, শিক্ষণীয় কার্যক্রম পরিবেশন প্রচার ও বিভিন্ন মনোরঞ্জন কার্যক্রম দৃশ্যমান ও শব্দমানের রূপে পরিবেশন করায় বেশি আদৃত হল। এরপরে অধুনা **ইন্টারনেট** প্রচলন হওয়ায় এটা এক প্রধান যোগাযোগ মাধ্যম হয়ে উঠল। দূরদর্শন, ইন্টারনেট ইত্যাদি দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যম হয়ে থাকায় লোকেদের মনে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারল। সেইজন্য একে সর্বশ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী **গণমাধ্যম** বলা হয়। আজকাল **সেলুলার** বা **মোবাইল ফোনের** সাহায্যে দেশে কিংবা বিদেশে থাকা লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ খুব সুবিধে হতে পারছে। এস.এম.এসের সাহায্যে ভাব ও তথ্যর আদানপ্রদান সহজ হতে পারছে।

আমাদের পৃথিবী অত্যন্ত বিরাট। অতীতে ভারত থেকে আমেরিকায় খবর পাঠানো অসম্ভব ছিল বা মাসের পর মাস লেগে যেত।

চিত্র ৬.১৯: সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন, ইন্টারনেট।

বর্তমানে কিন্তু সেই অসুবিধে নেই। আজকাল পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে অন্য স্থানে মাত্র কয়েক সেকেন্ডে অতি সহজে খবর পাঠানো যাচ্ছে। দূরদর্শন এবং ইন্টারনেট ব্যবহার দ্বারা অন্য দেশের খবর, সংস্কৃতি এবং চালচলনের সম্পর্কে জানতে পারা যাচ্ছে। সেলুলার ফোন এবং ইন্টারনেট ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে থাকা লোকেদের সঙ্গে সোজাসুজি কথাবার্তা করার সঙ্গে তারা কী করছে সেটাও দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীতে থাকা বিভিন্ন ব্যক্তিবিশেষ, অনুষ্ঠান এবং সংস্থার সঙ্গে এ প্রকার অন্তঃসংযোগীকরণ ব্যবস্থার উন্নতি হেতু আমাদের পৃথিবীর সংকুচিত হয়ে যাওয়ার মতো লাগছে। পৃথিবীর বিভিন্ন কোণে বা প্রান্তে থাকা লোকজনের মধ্যে মুহূর্তের মধ্যে কথাবার্তা ও ভাব বিনিময় হতে পারা হেতু আমাদের পৃথিবী একটি বিরাট গ্রামে পরিণত হয়েছে

প্রশ্নাবলী

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে লেখো।

(ক) জনবসতি বলতে কী বোঝায়?

(খ) উত্তর ভারতের সমতলভূমিতে অধিক জনসংখ্যা দেখা যাওয়ার কারণ কী?

(গ) পরিবহনের মুখ্য মাধ্যমগুলির নাম কী?

(ঘ) গ্রামাঞ্চলের লোকেরা কী কী কার্যে নিয়োজিত হয়ে থাকে?

(ঙ) গণমাধ্যম বলতে কী বোঝায়?

(চ) রেল পরিবহনের কী কী উপকারিতা রয়েছে?

(ছ) যোগাযোগ বলতে কী বোঝায়?

২। ঠিক উত্তরটি লেখো।

(I) কোন্‌টা যোগাযোগের মাধ্যম নয়?

(ক) টেলিফোন, (খ) বই, (গ) টেবিল।

(ii) কোন্ ধরনের সড়ক ভূমির নীচে নির্মাণ করা হয়?

(ক) ফ্লাইওভার, (খ) ভূতল সড়ক, (গ) জাতীয় রাজপথ।

(iii) কোন্ যান পরিবেশ দূষণ করে না?

(ক) সাইকেল, (খ) বাস (গ) উড়োজাহাজ।

(iv) একটি দ্বীপে যাওয়ার জন্য কোন্ পরিবহন মাধ্যমটি উপযুক্ত?

(ক) জাহাজ, (খ) রেল, (গ) গাড়ি।

(v) কার দ্বারা আমরা ঘরে এসে রথযাত্রা দেখতে পারব?

(ক) বাইনোকুলার (খ) দূরদর্শন (গ) বেতার।

৩. কারণ দর্শাও।

(ক) পাহাড়ি অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত জনবসতি দেখা যায়।

(খ) আজকাল পৃথিবী একটি বড় গ্রামে পরিণত হতে পেরেছে।

৪. 'ক' স্তম্ভের শব্দ সহ 'খ' স্তম্ভ থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে লেখো।

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
ইন্টারনেট	অভ্যন্তরীণ জলপথ
ক্যানেল পরিবহন	কেন্দ্রীভূতভাবে গঠিত বাসগৃহ
শহরাঞ্চল	যোগাযোগের মাধ্যম
ঘন জনবসতি	বহুমুখী কার্য থাকা অঞ্চল

৫. নিম্নে প্রদত্ত প্রত্যেক পরিস্থিতিতে তুমি কোন্ যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করবে ?

(ক) তোমার ঠাকুরদার শরীর হঠাৎ খারাপ হলে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে।

(খ) তোমার মা তাঁর পুরনো বাড়ি বিক্রি করতে চাইলে অন্যদের জানানোর জন্য।

(গ) তোমার মামার বিয়েতে যোগ দেওয়ার জন্য দু'দিন স্কুলে অনুপস্থিত থাকার কথা শিক্ষককে জানানোর জন্যে।

(ঘ) বাবার সঙ্গে নিউইয়র্ক বেড়াতে যাওয়া বন্ধুর সঙ্গে প্রতিদিন সম্পর্ক রাখতে।

পরিবেশিক প্রভাব ও অধিবাসীদের জীবন জীবিকা

সপ্তম অধ্যায়

প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের জীবনধারাকে প্রভাবিত করে বলে আমরা পড়েছি। এর সঙ্গে সম্পৃক্ত পরিবেশ ও সেখানকার অধিবাসী ও জীবজগৎ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক অঞ্চলে সদা সর্বদা সেখানকার পরিবেশ জনজীবন ও জীবজগতের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লেগে থাকে। এর ফলে উভয়ে পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। প্রত্যেকের কিছু না কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে থাকে।

চিত্র ৭.১: দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অববাহিকা

তুমি জানো কি?

নদী যেখানে সমুদ্রে পড়ে তাকে নদীর মোহনা বলে। আমাজন নদীর মোহনা পৃথিবীর সব চেয়ে বড় নদী মোহনা। এই নদীতে অনেক ছোট বড় নদী মিশে প্রশস্ত অববাহিকা সৃষ্টি করেছে।

উল্লেখযোগ্য যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থিতি, ভূমিরূপ, জলবায়ু ইত্যাদি ভৌগোলিক উপাদানের পার্থক্য দেখা যায়। এর ফলে সেই অঞ্চলগুলিতে পরিবেশে ভিন্নতা দেখা যায়। তাই জনজীবনে তারতম্য দৃষ্টিগোচর হয়। এই অধ্যায়ে পৃথিবীর কয়েকটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে জনজীবনের সম্পর্কের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

(ক) আমাজন অববাহিকায় জনজীবন:

চিত্র ৭.২ আমাজন অরণ্য

অবস্থিতি : আমাজন দক্ষিণ আমেরিকার মুখ্য নদী বলে আমরা জানি। মানচিত্রে আমরা দেখতে পারব যে নদী প্রায় বিষুব মণ্ডলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

জলবায়ু উদ্ভিদ ও জীবজন্তু:

এই অঞ্চলে সূর্যকিরণ পৃথিবীর ওপরে লম্বালম্বি পড়ায় এখানে তাপমাত্রা বেশি। এখানে প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্ণে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। তাই এর জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। এখানে শীত অনুভূত হয় না। এই অঞ্চলের অরণ্যে মুখ্যত তাল মেহগানি, আবলুস, ও রবার প্রভৃতি বৃক্ষ দেখা যায়। এখানকার অরণ্য খুব ঘন হওয়ায় সূর্যকিরণ প্রায় মাটিতে পড়ে না। রোদ না পড়ায় জমি স্যাঁতসেঁতে থাকে। তাই ছায়ায় বাড়তে পারা পাতা না থাকা বিভিন্ন প্রকার অর্কিড ও কিছু লতা জাতীয় পরাঙ্গ পুষ্ট উদ্ভিদ এখানে দেখা যায়। এই অরণ্যে বাঁদর, স্লথ্, উই খেকোটাপির নামক প্রাণী অনেক দেখা যায়। বিভিন্ন প্রকার সাপ, সরীসৃপ ও কুমিরদের এটা সুরক্ষিত স্থান। অ্যানাকোন্ডা এবং বোয়া জাতীয় ভয়ঙ্কর সাপ এখানেই দেখা যায়। হাজার হাজার জাতির কীটপতঙ্গ এবং মাছেদের এটা আদিভূমি। মাংসখেকো পিরানহা মাছ এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য মাছ। বিভিন্ন জাতির অদ্ভুত পক্ষী এখানে

তোমার জন্য কাজ:

মানচিত্রে এই নদীর গতিপথ দেখো এবং এটা কোন্ কোন্ দেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কোন্ মহাসাগরে পড়েছে লেখো।

চিত্র ৭.৩ টউকান

চিত্র ৭.৪ টাপির

দেখা যায়। তাদের মধ্যে টউকান ও নানা জাতির রঙিন পালক যুক্ত পক্ষী এই অরণ্যে বাস করে।

অধিবাসী ও অর্থনৈতিক অবস্থা:

সারা বছর প্রবল রোদ ও বৃষ্টির জন্য এ অঞ্চলের জলবায়ু অসহ্য ও অস্বাস্থ্যকর। তাই এখানে ঘন জনবসতির অনুকূল নয়। কিন্তু প্রকৃতির নানা প্রতিরোধ সত্ত্বেও এ অঞ্চলে অনেক জাতির আদিম অধিবাসী বাস করে।

তারা অরণ্যে শিকার করে, ফলমূল সংগ্রহ করে অথবা নদী থেকে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। কিছু অধিবাসী স্থানান্তরিত কৃষিকার্যও করে থাকে। এই প্রণালীতে এখানে কলা, আনারস, মিষ্টি আলু বা কাসাভা ও টাপিওকা ইত্যাদি চাষ করা হয়। আজকাল কফি, ভুট্টা এবং কোক্ জাতীয় অর্থকারী ফসলও চাষ করা হচ্ছে।

নিবিড় অরণ্যের জন্য এখানকার শিল্প উৎপাদন কিছু অরণ্যলব্ধ দ্রব্য ও কাষ্ঠ সম্পদের উপরে নির্ভর করে থাকে। কাষ্ঠ ভিত্তিক শিল্পের বৃদ্ধির জন্য এখন এখানে অরণ্যের পরিমাণ কমে কমে যাচ্ছে। অরণ্য ক্ষয়ের জন্য মৃত্তিকা নষ্ট হওয়ার সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা সৃষ্টি হচ্ছে।

তুমি জানো কি?

এ অঞ্চলের বন্য জীবজন্তু, প্রাকৃতিক উদ্ভিদ এবং অধিবাসীদের জীবন যাপন প্রণালী National Geography, Discovery প্রভৃতি টিভি চ্যানেলে দেখতে পাবে।

আজকাল এই অঞ্চলের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। লোকেরা রোপণ কৃষি ও খনির কাজের মতো নতুন নতুন কাজে নিযুক্ত থাকছে। এ অঞ্চলের গমনাগমন পথের অনেক উন্নতি হয়েছে।

চিত্র ৭.৫. অরণ্যক্ষয়।

তুমি জানো কি?

এই ধরনের ভৌগোলিক পরিবেশ বিশিষ্ট অঞ্চল গুলির মধ্যে আমাজন অববাহিকার লোহিত ভারতীয় কঙ্গো অববাহিকার পিগমি, মালয়েশিয়ার সেমাঙ্গ গোষ্ঠীর অধিবাসীরা বাস করে।

তুমি জানো কি?

আমাদের রাজ্যে আদিবাসীদের দ্বারা করা স্থানান্তরিত কৃষিকে পোড়ু চাষ বলা হয়। জঙ্গলের এক নির্দিষ্ট অঞ্চল পরিষ্কার করে আগুন লাগিয়ে তারা সেখানে চাষ করে। কিছু বছর পরে এই জমির উর্বরতা কমে গেলে, তারা অরণ্যের অন্য অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়। কয়েক বছর ব্যবধানে সেই অঞ্চলে পুনর্বার চাষ করে থাকে।

তুমি জানো কি?

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী অববাহিকার নিম্নশয্যায় মোহনার নিকট এক প্রকার অরণ্য দেখতে পাওয়া যায়। নোনাজল ও জোয়ারের জলে বেড়ে উঠতে পারা বৃক্ষকে এখানে দেখা যায়। তাই একে জোয়ারিয়া অরণ্য বলা হয়। এটা সুন্দরবন নামে পরিচিত। কারণ এই অরণ্যে সুন্দরী নামক বৃক্ষ বহুল পরিমাণে জন্মায়।

(খ) গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় জনজীবন

নদী ও তার উপনদীগুলি পর্বত থেকে উৎপত্তি হয়ে থাকে। পার্বত্য শয্যায় প্রবাহিত হওয়ার সময় মৃত্তিকা ক্ষয় করে থাকে। এবং একে নদীর মধ্যশয্যা ও নিম্নশয্যায় পলি মাটি ভাবে জমা করে থাকে। এই পলিমাটি অধিক উর্বর ও কৃষির জন্য খুবই উপযোগী তাই এই অঞ্চলের লোকেরা প্রধানত কৃষিজীবী।

অবস্থিতি:

আমাদের দেশ ভারতের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এই রকম এক পলি সঞ্চিত উর্বর সমতল অঞ্চল। মানচিত্র দেখে এর অবস্থিতি নির্ণয় করো। এই অঞ্চলের দক্ষিণে কর্কটক্রান্তি রেখা যাওয়ায় এটি উত্তরক্রান্তীয় অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলের প্রধান নদী গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র, উভয় নদী এক উর্বর

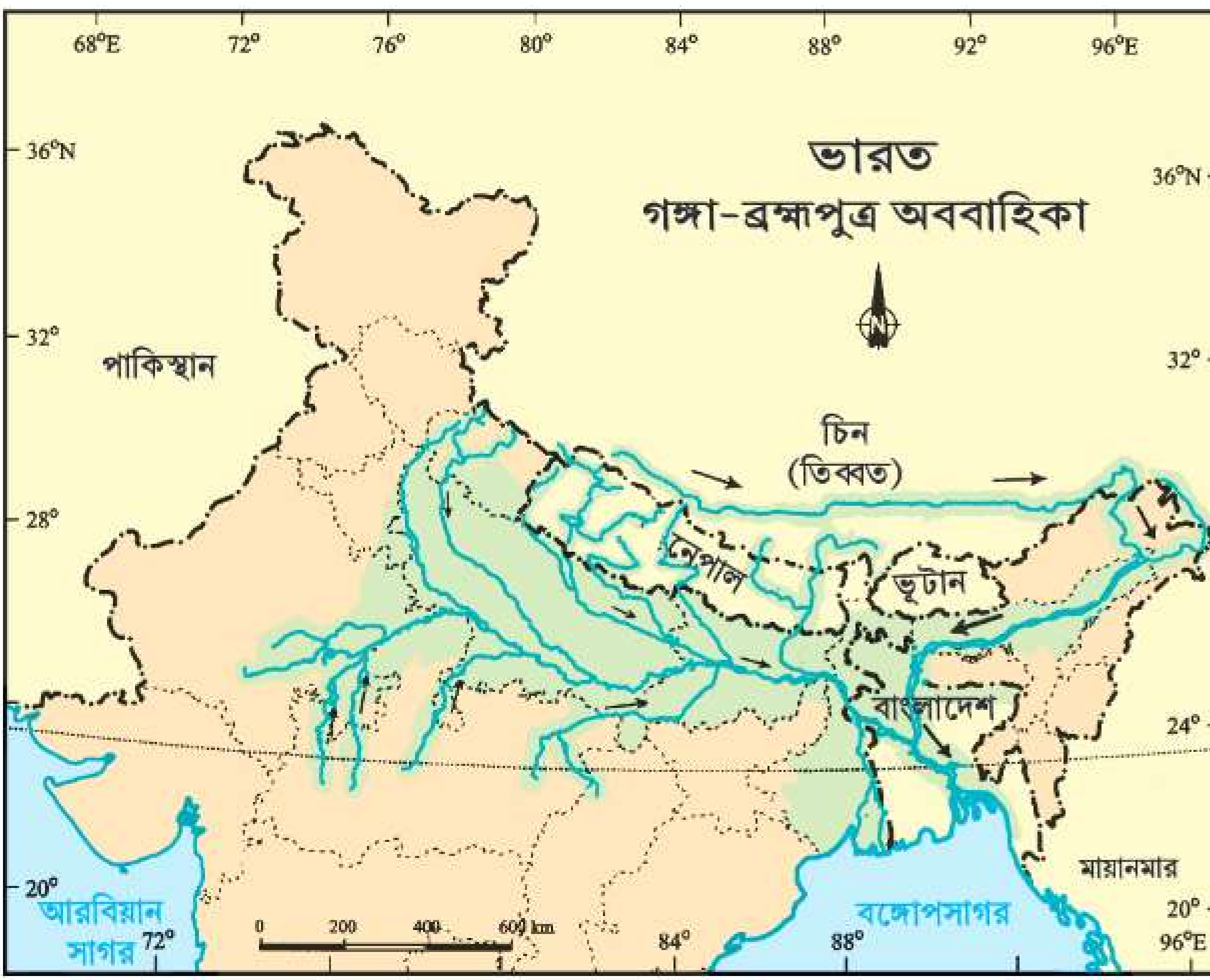

চিত্র ৭.৬. গঙ্গাব্রহ্মপুত্র অববাহিকা

ত্রিকোণ ভূমি গঠন করেছে। তাদের অনেক উপনদী আছে। মানচিত্র দেখে এই উপনদীগুলির নাম লেখো।

চিত্র ৭.৭. ব্রহ্মপুত্র নদী

জলবায়ু উদ্ভিদ ও জীবজন্তু

মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ থেকে এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু এর পশ্চিমাংশ সমুদ্র থেকে দূরে থাকায় এখানে মহাদেশীয় জলবায়ু অনুভূত হয়। তাই শীত ও গ্রীষ্মের প্রভাব অধিক হয়ে থাকে।

এই অঞ্চলে মৃত্তিকা ভেদে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ দেখা যায়। সাধারণত এখানে পর্ণমোচী অরণ্য দেখা যায়। এখানে শাল, পিয়াশাল, অশ্বত্থর মতো বৃক্ষ সকল দেখা যায়। সমতল অঞ্চলে বাঁশঝাড় ও আমবাগান আছে। আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চল, সিকিম প্রভৃতি রাজ্যের শীতল পার্বত্য অঞ্চলে সরলবর্গীয় অরণ্যে পাইন, ফার, দেবদারু প্রভৃতি বৃক্ষ দেখা যায়।

চিত্র ৭.৮. একশৃঙ্গ গন্ডার

চিত্র ৭.৯. কুমির

এই অরণ্যে বাঘ, হরিণ, বাঁদর, হাতি প্রভৃতি বন্যজন্তু দেখা যায়। ব্রহ্মপুত্র নদীর উপত্যকায় একশৃঙ্গ গন্ডার সুন্দরবনের বাঘ, এবং নদীর মোহনায় কুমির প্রভৃতি প্রাণী দেখা যায়। এই অঞ্চলের নদীতে রুই, কাতলা, শোল, প্রভৃতি মধুর মাছ প্রচুর পাওয়া যায়। তাই এই অঞ্চলের লোকেদের প্রধান খাদ্য ভাত ও মাছ।

তুমি জানো কি?

গরমকালে পাতা ঝরিয়ে দেওয়া গাছকে পর্ণমোচী বলে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর জলে শুশুক নামে এক প্রকার ডলফিন্ দেখা যায়। কলকারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত জল, শহর থেকে নির্গত নর্দমার জল নদীতে মিশে জল প্রদূষিত করার ফলে ক্রমশ এই শুশুক ও মিষ্টি জলের মাছেরা কমতে লেগেছে। এদিকে সচেতন দৃষ্টি না দিলে ভবিষ্যতে এরা বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

চিত্র ৭.১০. শুশুক ডলফিন্

অধিবাসী ও অর্থনৈতিক অবস্থা

এটা পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল অঞ্চল উর্বর মৃত্তিকা, জলের সুলভতা ও স্বাস্থ্যপ্রদ জলবায়ুর জন্য এখানে সমতল অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক। এই অঞ্চলে লোকে ধান, গম, বাজরা, যব, আখ, মুগ বিউলি, সর্ষে প্রভৃতি ফসল চাষ করে। বিস্তৃত অঞ্চলে কলাবাগান দৃষ্টিগোচর হয়। আসাম ও

চিত্র ৭.১১. সোপান চাষ।

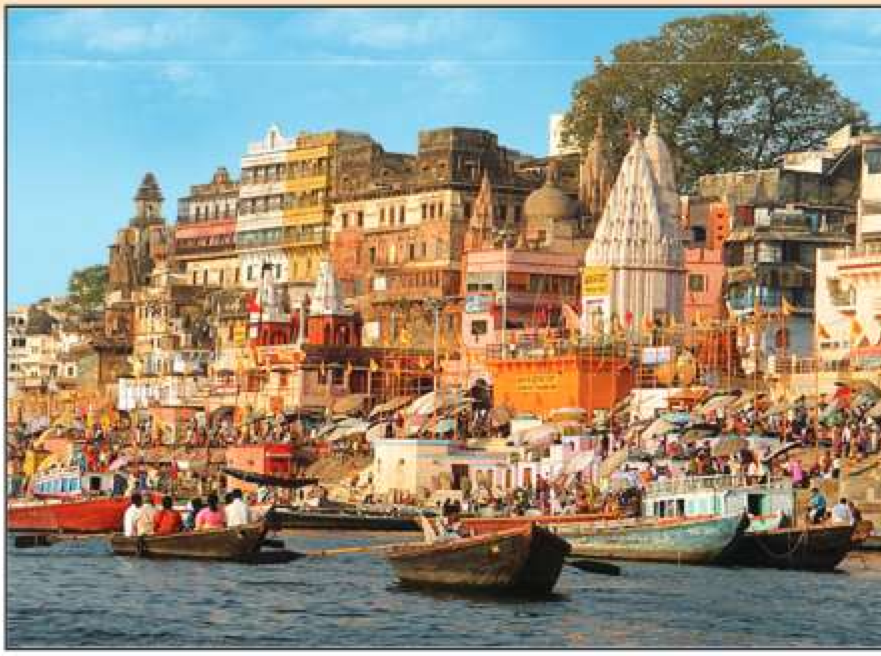

চিত্র ৭.১২: গঙ্গা নদীর তীরে বারাণসী শহর।

পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলে চা চাষ করা হয়। আসাম ও বিহারের কিছু অঞ্চলে লোকে রেশম পোকা চাষ করে থাকে।

এই অববাহিকায় গঙ্গানদীর কূলে, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ কানপুর, বারাণসী কলকাতা এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর কূলে গুয়াহাটি প্রভৃতি বড় বড় শহর অবস্থিত। আধুনিক শিল্প স্থাপনের দ্বারা এই শহরগুলির জনসংখ্যার ঘনত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘন জনবসতির দরুন এই অঞ্চলের পরিবেশ দূষিত হতে লেগেছে। উন্নত রেলপথ, সড়কপথ ও বিমানপথ দ্বারা এই অঞ্চল দেশবিদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। তাই দেশ বিদেশ থেকেও বহু পর্যটক এই অঞ্চল পরিভ্রমণে আসে। এইসব কারণে এ অঞ্চলে পর্যটন শিল্পের বিকাশ সম্ভব হতে পেরেছে।

(গ) তৃণভূমি অঞ্চলে জনজীবন:

সাধারণত বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষলতা পরিপূর্ণ অঞ্চলকে অরণ্য বলা হয়। সেই রকম তৃণ বা ঘাস পরিপূর্ণ অঞ্চলকে তৃণভূমি বলা হয়। তৃণভূমি অঞ্চল পৃথিবীর প্রায় এক চতুর্থাংশ স্থান অধিকার করে রয়েছে। জলবায়ুর আধারে এটা দুই প্রকার; যথা: ক্রান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চল ও নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চল। জলবায়ু ও মৃত্তিকার ভেদে এই অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। এই পাঠ্যে নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষের জীবনযাপন প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

তুমি জানো কি?

আগ্রার যমুনা নদীর কূলে তাজমহল, গঙ্গা যমুনার মিলনস্থলে এলাহাবাদ উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের বৌদ্ধস্তূপ, লক্ষ্ণৌয়ের স্থাপত্যকলা, আসামের কাজিরাঙ্গা ও মানস জাতীয় অভয়ারণ্য ও অরুণাচল প্রদেশের আদিবাসী সংস্কৃতি পর্যটকদের আকৃষ্ট করে থাকে।

চিত্র ৭.১৪: বাঘ

তুমি জানো কি?

উভয় গোলার্ধে ১০ ডিগ্রি থেকে ২৫ ডিগ্রি সমাক্ষরেখার মধ্যে ক্রান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চল দেখা যায়। আফ্রিকার সুদান জিম্বাবোয়ে, মধ্য নাইজেরিয়া, অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের পশ্চিম পার্শ্ব, দক্ষিণ আমেরিকার ওরিনোকো নদীর অববাহিকা এর অন্তর্ভুক্ত।

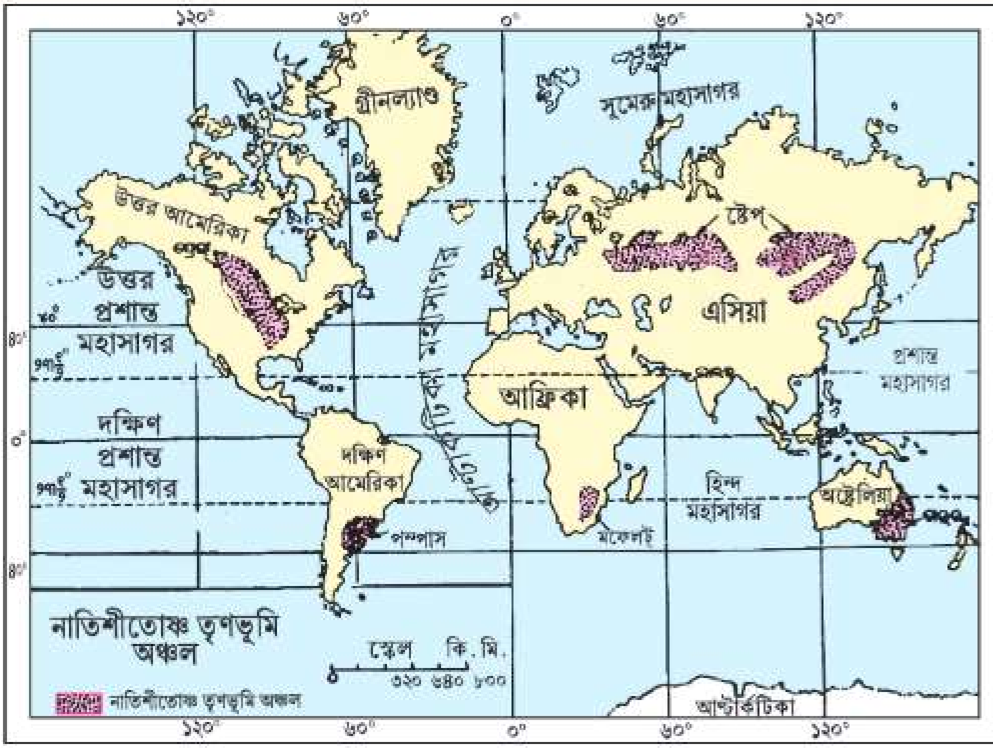

চিত্র ৭.১৪: পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চল।

অবস্থিতি:

উভয় গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল অর্থাৎ ৩৫ ডিগ্রি থেকে ৫৫ ডিগ্রি সমাক্ষরেখার মধ্যে নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি দেখা যায়। এশিয়া ও ইউরোপের স্টেপ অঞ্চল, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেরী, আর্জেন্টিনার পম্পাস, দক্ষিণ আফ্রিকার ফেলট্ বা ভেলড্ এবং অস্ট্রেলিয়ার ডাউনস্ এই শ্রেণীর তৃণভূমি।

তোমার জন্য কাজ

মানচিত্রে পৃথিবীর মুখ্য তৃণভূমি অঞ্চলগুলো খুঁজে বের করো এবং এক রেখাঙ্কিত পৃথিবীর মানচিত্রে প্রত্যেকটিকে রং এবং সংকেত মাধ্যমে দেখাও।

জলবায়ু, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু:

এই ধরনের তৃণভূমি অঞ্চলে সামুদ্রিক বায়ুর প্রভাব পড়ে না। এখানে কেবল গ্রীষ্ম ও শীত ঋতু অনুভূত হয়। গ্রীষ্ম ঋতুতে ভীষণ গরম আর শীত ঋতুতে খুব ঠান্ডা অনুভূত হওয়া এই অঞ্চলের জলবায়ুর লক্ষণ। বার্ষিক মোটামুটি বৃষ্টির পরিমাণ প্রায় ৫০ সেমি। এই ধরনের জলবায়ুকে নাতিশীতোষ্ণ মহাদেশীয় জলবায়ু বলা হয়।

নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলে গ্রীষ্ম ঋতুর আরম্ভে বৃষ্টিপাত হয়। এই অঞ্চলে শীতকাল গ্রীষ্মকাল থেকে দীর্ঘ হয়।

কম বৃষ্টিপাত হেতু এ অঞ্চলে নিবিড় অরণ্যের পরিবর্তে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি দেখা যায়। যে দিকে তাকালে বিস্তীর্ণ তৃণ আচ্ছাদিত অঞ্চল দেখতে পাওয়া যায়।

চিত্র ৭.১৫: কাউবয়

চিত্র ৭.১৬: বাইসন

মাঝে মাঝে গুল্ম জাতীয় কাঁটাঝোপ দেখা যায়। এখানে ক্ষুদ্র, পুষ্টিকর ও নরম ঘাস জন্মায়। এখানে বাইসন, দ্রুতবেগে যাওয়া কৃষ্ণসার হরিণ জাতীয় মৃগ, জংলি মোষ, ভেড়া, ইত্যাদি তৃণভোজী প্রাণী বাস করে।

নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলে স্থল বিশেষে পাইন, ম্যাপল, হেমলক, উইলো, পপলার ইত্যাদি পর্ণমোচী বৃক্ষ জন্মে থাকে।

অধিবাসী ও অর্থনৈতিক অবস্থা:

এই অঞ্চলে মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ অধিক থাকায় এটা বিশেষ উর্বর ও কৃষির জন্য উপযোগী। উর্বর মৃত্তিকা ও নাতিশীতোষ্ণ মহাদেশীয় জলবায়ু গম চাষের জন্য বিশেষ অনুকূল হওয়ায় এখানে প্রচুর গম চাষ করা হয় ও বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

স্টেপ অঞ্চলের কিরগীজ এবং প্রেরী অঞ্চলের লোহিত ভারতীয়রা গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পশুপালন করে থাকে।

আজকাল উত্তর আমেরিকার প্রেরী, রাশিয়ার স্টেপ, আর্জেন্টিনার পম্পাস অঞ্চলে অনুকূল জলবায়ু ও উপযুক্ত মৃত্তিকা হেতু ভুট্টা, গম, বাজরা ইত্যাদি ফসল চাষ করা হচ্ছে। এছাড়া অধিবাসীরা আলু, সয়াবিন, তুলো আলকালফা (একপ্রকার ঘাস) চাষ করছে। দুধ ও মাংসের জন্য পশুপালন করে অঞ্চলের লোকে উপকৃত হচ্ছে। এখানে পশুপালন অর্থকরী চাষের মতো এক লাভজনক ব্যবসা।

এই তৃণভূমি অঞ্চলে খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়ার পরে অধিকাংশ অধিবাসী এখন খনি অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। কিছু অঞ্চলে কলকারখানাও গড়ে উঠেছে। ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে এসে এদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

তোমার জন্য কাজ:

গম ছাড়া এ অঞ্চল থেকে আর কোন্ কোন্ দ্রব্য ব্যবসা সূত্রে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে লেখো।

জেনে রাখো:

নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ গোপালন কেন্দ্রকে র‍্যাঞ্চ (Ranch) বলা হয়।

মরুভূমি অঞ্চলে জনজীবন:

জলই জীবন বলে আমরা জানি। জল না থাকলে সমস্ত জীবজগৎ অর্থাৎ জীবজন্তু মানুষ টিকে থাকা অসম্ভব। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, অল্প পরিমাণ জল উপলব্ধ হওয়া অনেক অঞ্চলেও লোকেরা বাস করে। তারা প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জীবনযাপন করছে। বৃষ্টির অভাবে জল থাকে না, চাষবাস হবে কী করে। এখানে কৃষিকার্য বা পশুপালন সম্ভব নয়। এই অঞ্চলকে মরুভূমি বা মরু অঞ্চল বলা হয়। তাপমাত্রার ভিত্তিতে মরুভূমি দুই প্রকার। যথা: উষ্ণ মরু অঞ্চল ও শীতল মরু অঞ্চল।

উষ্ণ মরু অঞ্চলে জনজীবন:

পৃথিবীর কিছু কিছু অঞ্চলে খুব কম বৃষ্টিপাত হয়। যার ফলে খুব কম বৃক্ষলতা জন্মায়। এখানে তাপমাত্রা খুব কম বা অতি বেশি হয়ে থাকে।

অবস্থিতি:

সাহারা মরুভূমি পৃথিবীর বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূমি। অ্যাটলাস দেখে বা মানচিত্র দেখে সাহারার অবস্থিতি তথা তার চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশগুলোর নাম লিখে রাখো।

উষ্ণ মরু অঞ্চল উভয় গোলার্ধের মহাদেশের পশ্চিম পার্শ্বে ১৫ ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রি সমাক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত। আমাদের দেশের থর মরুভূমি ২ লক্ষ বর্গ কিমি অঞ্চলে বিস্তৃত। কিন্তু সাহারা মরুভূমি ৮.৫৪ লক্ষ কিমি অঞ্চল অধিকার করে রয়েছে।

তুমি জানো কি?

ভূপৃষ্ঠের যে অঞ্চলে চারিদিকে বালি, প্রবল রোদ, অল্প বৃষ্টি বা বৃষ্টিহীন অঞ্চল, বৃক্ষলতা শূন্য তাকে উষ্ণ মরু অঞ্চল বলে। যথা—আমাদের দেশের থর ও আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি। যেখানে চারদিকে প্রবল ঠান্ডা ও ভূমি বরফাচ্ছন্ন থাকে। সেখানে গাছপালা বাড়তে পারে না। সেই ধরনের অঞ্চলকে শীতল মরুভূমি বলা হয়। গ্রিনল্যান্ড ও তুন্দ্রা অঞ্চল এই ধরনের মরুভূমি।

চিত্র ৭.১৭: পৃথিবীর মরু অঞ্চল।

চিত্র ৭.১৮: সাহারা মরুভূমি।

জলবায়ু উদ্ভিদ ও জীবজন্তু: উষ্ণ মরুভূমির তাপমাত্রা যথেষ্ট বেশি। বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না কিংবা খুব কম হয়। তাই এর জলবায়ু উষ্ণ ও শুষ্ক। এখানে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রির ওপর উঠে যায়। এবং শীতকালে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে চলে যায়। মাঝে মাঝে –১৫ ডিগ্রিও হয়ে যায়। এখানে দিনের বেলা খুব গরম আর রাতের বেলা খুব শীত অনুভূত হয়। এই অঞ্চলে অধিক তাপমাত্রার প্রভাবে বাষ্পীভবন তীব্র হয়ে থাকে। ঘরে ফলে এখানকার মাটি নোনা। নোনা মাটি ও শুষ্কতার জন্য এখানে কাঁটাজাতীয় গুল্ম তথা ক্যাকটাস, ফণিমনসা, নাগফেনী প্রভৃতি মরুজাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়। মরূদ্যান অঞ্চলে খেজুর, তাল, আকশিয়া ইত্যাদি গাছ দেখা যায়। উট এ অঞ্চলের প্রধান পশু। পরিবহন ও জীবিকার্জনের জন্য উট বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে। এছাড়া শিয়াল, খ্যাঁকশিয়াল, গুলবাঘ প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণী এই অঞ্চলে দেখা যায়। এখানে কাঁকড়াবিছে, টিকটিকি, গিরগিটি, সাপ প্রভৃতি সরীসৃপ প্রচুর সংখ্যায় দেখা যায়।

তোমার জন্য কাজ

মানচিত্র দেখে কিছু উষ্ণ মরুভূমি ও কিছু শীতল মরুভূমির নাম লেখো।

চিত্র ৭.১৯: মরুভূমির ভূদৃশ্য

তুমি জানো কি?

সাহারা মরুভূমির পার্বত্য অঞ্চলে কিছু শিলালিপির সন্ধান পাওয়া গেছে। এতে নদী, কুমির, অরণ্য, হাতি, সিংহ জিরাফ, উট, ছাগল ভেড়া প্রভৃতি পশুদের চিত্র দেখতে পাওয়া গেছে। একদা এ অঞ্চল সমতলভূমি ও অরণ্য আচ্ছাদিত ছিল বলে এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে।

মরুভূমির কিছু স্থানে জলের ঝোরা দেখা যায়। একে মরুঝোরা বলা হয়। এর আশেপাশে কিছু কাঁটাগাছ, খেজুরের গাছ ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। একে মরূদ্যান বলে।

অধিবাসী ও অর্থনৈতিক অবস্থা:

সাহারা অঞ্চলে যাযাবর, কৃষিজীবী এবং কিছু স্থায়ী অধিবাসী বাস করে। মরু অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানত যাযাবর। চারণভূমির খোঁজে এরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। এই যাযাবর শ্রেণীর অধিবাসীরা বেদুইন নামে পরিচিত। এরা উট, গাধা, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশুপালন করে। এই পশুদের কাছ থেকে এরা দুধ লোম চামড়া সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

মরুভূমির মরুঝরার কাছে থাকা মরূদ্যানে কিছু অধিবাসী তাল, খেজুর, তরমুজ, জাতীয় ফসল চাষ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করে থাকে।

এছাড়া নীল নদ অববাহিকার অঞ্চলের জলসেচিত অঞ্চলে এবং খনি খাদান অঞ্চলে কিছু অধিবাসী স্থায়ী ঘরদোর করে রয়েছে। এরা ভুট্টা, বার্লি, কাপাস, বাজরা, আখ প্রভৃতি চাষ করে থাকে। এ অঞ্চলে কাপাস হচ্ছে মুখ্য অর্থকারী ফসল। এছাড়া কেউ কেউ নুন তৈরির কাজেও নিযুক্ত থাকে। এই অঞ্চলের অন্তর্গত আলজিরিয়া, লিবিয়া ও ইজিপ্টে তৈলখনির সন্ধান পাওয়া গেছে। এখন সেখানকার লোকেদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হতে লেগেছে। গমনাগমনের ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়েছে। আজকাল উটের বদলে ট্রাকে করে মাল পরিবহন হচ্ছে। তুয়ারেগ জাতির অধিবাসীরা পর্যটন ক্ষেত্রে নিজেদের নিযুক্ত করে দেশের প্রগতিতে সহায়ক হচ্ছে।

শীতল মরুভূমি অঞ্চলে জনজীবন:

অবস্থিতি: উষ্ণ মরুভূমির মতো শীতল মরুভূমিতেও বেঁচে থাকা কষ্টকর। আমাদের উত্তরে লাদাখ নামে এরকম এক শীতল মরুভূমি রয়েছে। মানচিত্র দেখো। জম্মু-কাশ্মীরের পূর্ব পার্শ্বে এটা অবস্থিত। এর উত্তরে কারাকোরাম পর্বত শ্রেণী ও দক্ষিণে জ্যাস্কার পর্বত আছে। এই অঞ্চল থেকে অনেক ছোট বড় নদী বেরিয়েছে। এখানে নদীর খাদ, দহ, তথা উপত্যকা দেখা যায়।

জলবায়ু, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু:

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এ অঞ্চলের সর্বনিম্ন উচ্চতা ২.৭৫ কিমি এবং সর্বোচ্চ ৭.৬৭ কিমি। এত উঁচুতে থাকায় এর জলবায়ু অত্যধিক ঠান্ডা ও শুষ্ক। গ্রীষ্ম ঋতু এখানে অল্পস্থায়ী। এই ঋতুতে দিনের তাপমাত্রা ০ ডিগ্রি

তুমি জানো কি?

লাদাখ শব্দটি 'লা' এবং 'দাক্' শব্দ নিয়ে গঠিত। 'লা' শব্দের অর্থ গিরিপথ এবং 'দাক্' শব্দের অর্থ দেশ। এই অঞ্চলকে কাপাচানও বলা হয়। এর অর্থ বরফভূমি। পৃথিবীর অন্যতম শীতল স্থান দ্রাস এবং গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি কার্গিল এই অঞ্চলে অবস্থিত।

চিত্র ৭.২০: লাদাখ।

সেলসিয়াস থেকে সামান্য উপরে থাকে এবং রাত্রে তাপমাত্রা -৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নেমে আসে। এখানে শীতকাল অত্যন্ত কষ্টদায়ক। তাপমাত্রা প্রায়শ -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে।

পাকিস্তান ও চীন সীমার সঙ্গে লেগে থাকা এই অঞ্চলে আমাদের সৈন্যবাহিনী দিবারাত্র জাগ্রত প্রহরীর মতো পাহারা দিচ্ছে।

ভূমি বরফে আচ্ছাদিত থাকায় এই অঞ্চল প্রায় বৃক্ষশূন্য। কোথাও কোথাও স্প্রুশ ও ওক্ জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়।

চারণভূমি এখানে বিরল। গ্রীষ্মকালে বরফ সামান্য গলে যাওয়ায় আপেল, নাসপাতি প্রভৃতি বৃক্ষ ফুল-ফল ধারণ করে।

এই অঞ্চলে রবিন ও তিব্বতীয় তুষার মুরগির মতো খুব সুন্দর ও মূল্যবান পাখি দেখা যায়। এরা অসহ্য ঠান্ডা থেকে রক্ষা পাবার জন্য ও খাদ্য অন্বেষণে

শীতকালে অন্যত্র উড়ে যায়। পাহাড়ি ছাগল, ভেড়া, চমরী পাই, এবং এক ভিন্ন ধরনের কুকুর এ অঞ্চলের পশুদের মধ্যে অন্যতম।

দুধ, মাংস ও চামড়ার জন্য এখানকার অধিবাসীরা, পাহাড়ি বুনো ছাগল, এবং ভেড়া প্রভৃতি পালন করে থাকেন। চমরী গরুর দুধ থেকে ছানা মাখন প্রস্তুত করে থাকে। এই চমরী গাইয়ের ঘন লোম থেকে ঠাকুরের পুজোর জন্য চামর পাখা তৈরি করা হয়। পশুদের লোম থেকে পশম প্রস্তুত হয়।

অধিবাসী ও অর্থনৈতিক অবস্থা:

এই অঞ্চলের জলবায়ু জনবসতির জন্য প্রতিকূল। কিন্তু প্রকৃতির প্রতিরোধ সত্ত্বেও এখানে অধিকাংশ বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীর লোকে বাস করে। এই অঞ্চলে অনেক জায়গায় বৌদ্ধ বিহার ও ধ্বংসস্তূপের ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

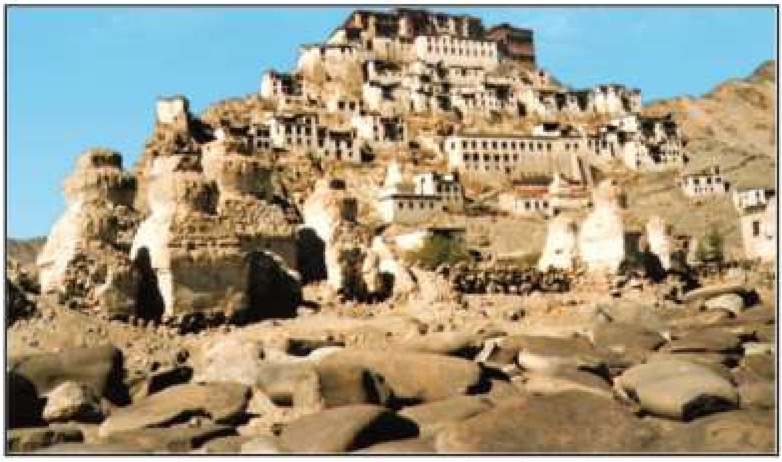

চিত্র ৭.২১: লাদাখের বৌদ্ধবিহার

এখানে গ্রীষ্ম ঋতুতে কিছু স্থানে লোকে বার্লি, আলু, মটর, বিল্ ইত্যাদি চাষ করে থাকে। শীতকালে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বাইরে যায়। বাড়িতে থাকলে একত্রিত হয়ে আনন্দ উৎসব পালন করে। এই অঞ্চলের স্ত্রী লোকেরা অধিক পরিশ্রমী। এরা ঘরের কাজ ছাড়াও চাষের কাজও করে থাকে। অনেকে আবার ছোটখাট ব্যবসাও করে।

লেহ হচ্ছে লাদাখের সদর মহকুমা, প্রধান শহর এবং বাণিজ্য কেন্দ্র। এটা ১ডি (1D) নম্বর জাতীয় রাজপথ দ্বারা শ্রীনগরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। এখানকার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার জন্য বহু পর্যটক আসে।

চাষবাস, জল এবং জ্বালানির অভাব সত্ত্বেও এখানকার অধিবাসীরা দুঃখ দৈন্যের ভেতর সুখের সন্ধান করে। এখানকার অধিবাসীরা ক্রমশ আধুনিক জীবন যাপন অবলম্বন করতে লেগেছে এবং নিজেদের অঞ্চল সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করছে।

প্রশ্নাবলী

১। **নিম্নলিখিত প্রত্যেকের নাম লেখো।**

(ক) ভারতের শ্রীনগর ও লাদাখকে সংযুক্ত করা জাতীয় রাজপথ

(খ) পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত নদী

(গ) গঙ্গা নদীর মোহনায় থাকা অরণ্য

(ঘ) আগ্রা শহরের কাছে প্রবাহিত প্রধান নদী

(ঙ) 'মানস' অভয়ারণ্য থাকা রাজ্য

২। **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর একটি বাক্যে লেখো।**

(ক) অ্যানাকোন্ডা সাপ কোন্ অরণ্যে বেশি দেখা যায়।

(খ) নদীর শয্যাকে কত ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে? সেগুলোকে কী বলা হয়?

(গ) মরূদ্যান কাকে বলে?

(ঘ) শীতল মরুভূমি কাকে বলে?

৩। **কারণ দেখাও।**

(ক) আমাজন অববাহিকায় ঘন জনবসতি দেখা যায় না।

(খ) নিরক্ষীয় অঞ্চলের অরণ্যে পরজীবী লতা জাতীয় উদ্ভিদ বেশি দেখা যায়।

(গ) নদী পার্বত্য অঞ্চলে প্রবাহিত হওয়ার সময় তার স্রোত প্রখর থাকে।

(ঘ) লাদাখ অঞ্চলে প্রায় তৃণভূমি দেখা যায় না।

৪। **নিম্নে 'ক' স্তম্ভে দেওয়া প্রত্যেক দেশ স্থানের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভে দেওয়া উপযুক্ত শব্দ সহ জুড়ে লেখো।**

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
ইন্দোনেশিয়া	অভয়ারণ্য
এলাহাবাদ	হাউসা
সাহারা	ক্যাম্পোস
নাইজেরিয়া	নদীর সঙ্গমস্থল
কাজিরাঙ্গা	উষ্ণ মরু
ব্রাজিল	নিরক্ষীয় জলবায়ু
	শীতল মরু

৫। ঠিক উত্তরটি বেছে লেখো।

(ক) কোথায় নিরক্ষীয় জলবায়ু অনুভূত হয় না।

(১) ইন্দোনেশিয়া (২) গঙ্গা অববাহিকা (৩) কঙ্গো অববাহিকা (৪) আমাজন অববাহিকা।

(খ) পিগমিরা কোন্ অঞ্চলের অধিবাসী?

(১) ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা (২) গঙ্গা অববাহিকা (৩) কঙ্গো অববাহিকা (৪) আমাজন অববাহিকা।

(গ) কোন্ অঞ্চলে বেদুইন জাতির অধিবাসী দেখা যায়?

(১) থর মরুভূমি (২) সাহারা মরুভূমি (৩) পম্পাস (৪) শীতল মরুভূমি।

(ঘ) কোন্ শহরটি গঙ্গা অববাহিকায় অবস্থিত নয়?

(১) কলকাতা (২) লক্ষ্ণৌ (৩) বারাণসী (৪) গৌহাটি।

৬। সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী লেখো।

(ক) ক্রান্তীয় তৃণভূমি (খ) মাসাই

(গ) সেমাঙ্গ (ঘ) সাভানা

(ঙ) পৃথিবীর প্রাকৃতিক পশুশালা।

৭। স্টেপ অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবিকা নির্বাহ প্রণালী সংক্ষেপে লেখো।

৮। শীতল মরু অঞ্চলে জনজীবন পরিবেশ দ্বারা কীভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে বুঝিয়ে লেখো।

৯। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার জলবায়ু উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর সম্বন্ধে আলোচনা করো।

ARMS YOU FOR LIFE AND A CAREER......

INDIAN ARMY

CATEGORY	EDUCATION	AGE
(1) Soldier (General Duty) (All Arms)	SSLC/Matric 45% marks in aggregate and 32% in each subject. No % required if Higher Qualification, then only pass in matric ie. 10+2 and above.	17 1/2 - 21Yrs
(2) Soldier (Technical) (Technical Arms, Artillery)	10+2/Intermediate exam. pass in Science with Physics, Chemistry, Maths and English.	17 1/2 - 23 Yrs
(3) Soldier Clerk/Store Keeper Technical (All Arms)	10+2/Intermediate examination pass in any stream (Arts, Commerce, Science) with 50% marks in aggregate and min. 40% in each subject. No stipulation of marks for higher qualification.	17 1/2 - 23 Yrs
(4) Soldier Nursing Assistant (Army Medical Corps)	10+2/Intermediate exam pass in Science with Physics, Chemistry, Biology and English with minimum 50% marks in aggregate and minimum 40% marks in each subject.	17 1/2 - 23 Yrs
(5) Soldier Tradesman (All Arms)	Non Matric	17 1/2-23 Yrs
(6) Soldier (General Duty) Non Matric (All Arms)	Non Matric	17 1/2-21 Yrs
(7) Surveyor Auto Cartographer (Engineers)	BA/BSc with Maths having passed Matric & 12th (10+2) with Maths & Science	20-25 Yrs
(8) JCO (Religious Teacher) (All Arms)	Graduate in any discipline. In addition, qualification in his own religious denomination.	27-34 Yrs
(9) JCO (Catering) (Army Service Corps)	10+2, Diploma/Certificate course of a duration of one year or more in Cookery/Hotel Management and Catering technology from recognized University. AICTE recognition is not mandatory.	21-27Yrs
(10) Havildar Education	GP "X" - M.A./M.Sc. Or B.A., B.Ed/B.Sc., B.Ed. GP "Y" - B.A./B.Sc. Without B.Ed.	20-25 Yrs

Note: Dispensation in Education for enrolment as Sol (GD) is permissible to some selected States/Region/Class & Community by the Govt.
Details may be obtained from nearest ARO/ZRO.

(This data is only of informative value and subject to change.) For Details contact Recruiting staff.
Visit us at www.joinindianarmy.nic.in E-mail: recruitingdirectorate@vsnl.net